কাভার স্টোরি **তাদের অবরুদ্ধ করুন!**

**ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার কার্যকর পদক্ষেপ**

**খুরাসানের জিহাদে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন**

**নবীদের ভূমি আপনার অপেক্ষায়!**

**পশ্চিমা অর্থনীতির মূলে আঘাত**

**পরভূমে**

AN-NASR

# ভেতর বাহির



## তাদের অবরুদ্ধ কর!

-আদম ইয়াহিয়া গাদান

আমাদের জন্য এটাই সময় সেয়ানে সেয়ানে লড়াই করার এবং নিজস্ব অবরোধ গড়ে তোলার এবং ইহুদী ও ক্রুসেডারদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার এমন জায়গায় আঘাত করার মাধ্যমে যেখানে আঘাত করলে তারা আহত হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফিন্যান্স নামে পরিচিত তাদের অর্থনীতির হৃদপিণ্ড ও জীবনীশক্তিকে আঘাত করতে হবে।

# সম্পাদকের পক্ষ থেকে

প্রিয় পাঠক,

৯/১১ ঘটনার প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। তের বছরে এসে, কারো পক্ষেই এই কাঁপন ধরানো ঘটনার দ্বারা যে গতিময় পরিবর্তন এসেছিল তা অগ্রাহ্য করার মত নয়। অন্য দিকে এটি সত্য যে আমাদের সংগ্রাম ৯/১১ এর সাথে শুরু হয়নি এবং আমাদের জিহাদের মূল বিশ্বাসও ইতিহাসের দিক থেকে অনেক গভীরে, অনেক গুলো ঘটনা ঘটার ফলে এটি এখনও গতি পথে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আফগানিস্তান থেকে অপমান জনক সৈন্য প্রত্যাহারের লগ্নে, আজ পশ্চিমা বিশ্ব একে না দেখার ভান করছে যা তারা আমাদেরকে 'গুহা' থেকে বের করে আনার এবং পাথর যুগের বোমা বৃষ্টির মত কাজে নিয়োজিত ছিল। এক দশক বা এরও বেশি সময় ধরে, পশ্চিমা নেতারা এবং বুদ্ধিজীবীরা 'ইসলামকে পুনঃগঠন', 'মডারেট মুসলিমদের নেটওয়ার্ক তৈরী করা' এবং 'জলাভূমি শুকানো'র মত কাজে তাদের মস্তিষ্ককে আবিষ্ট করে রেখেছে যা জিহাদকে কায়েম রাখছে এবং ইসলামের পূনর্জাগরণ যা মুসলিম বিশ্বের পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামিক মাগরিবের আনাচে-কানাচে পোঁছে গেছে এ ব্যাপারে তারা তাদের মাথা ঘামিয়ে এক কঠিন সময় পার করছে। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন রথী মহারথীরা এটা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে যে, ঠিক কি কারণে চরম প্রতিকূল পরিবেশেও এই মানুষগুলোর মন এক অনন্যসাধারণ বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। তারা এটাও অনুধাবন করতে পারেনি ঠিক কি কারণে এই মানুষগুলো পরকালের জন্যে দুনিয়ার জীবন বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না।

পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সময় কিছু বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছিল। পশ্চিমারা পূর্বেও এটা মানতে নারাজ ছিল এবং নৈতিকতা বিবর্জিত হওয়ার কারণে এখনো স্বীকার করতে নারাজ যে, তাদের এই যুদ্ধ শুধুমাত্র তোরাবোরাতে অবরুদ্ধ একশ জন মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধেও ছিল না; বরং তাদের এই যুদ্ধ ছিল স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে কাফিরদের সকল খনিজ সম্পদও খরচ করতে দাও, আরও বড় এবং আরও শক্তিশালী জোট গঠন করে এবং তাদের জাতীয় বাজেটের পুরোটাই মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যয় করতে দাও, কিন্তু ইতিহাসের শক্তিকে অবজ্ঞা করার এই প্রয়াস চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

"নিঃসন্দেহে যে সব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধা দান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরও ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (আল কোরআন- ৮:৩৬)

সম্ভবত পশ্চিমা বিশ্ব ভুলে গেছে যে, এটি খিলাফাহ পতনের যুগ নয়। এটি সেই শতাব্দী নয় যখন উম্মাহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে খন্ড-বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল এক নব সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির মরণ ছোবলের দ্বারা। এটি আরব জাতীয়তাবাদের যুগ নয়, নয় সমাজতন্ত্রবাদ কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তমনা আদর্শের যুগ। এটি হল উম্মাহর জন্য আশার যুগ; এমন যুগ যা খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং আল-আকসা স্বাধীন করার, যা সঙ্গত বর্ধমান আদর্শ। এটি হচ্ছে সেই যুগ যখন উম্মাহ তার বিভক্তির সকল সীমারেখাকে অতিক্রম করে ফেলেছে। এটি, নিঃসন্দেহে, ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবর্তন করার শতাব্দী।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশ মান্যকর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।" ( আল কোরআন- ৮:২৪) কিছু কিছু মুফাসসির যেমন ইবনে ইসহাক এর মতে, 'যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন' এর একটি অর্থ হল জিহাদ। সাম্প্রতিক অতীতে, উম্মাহর এক বিশাল অংশ সাড়া দিয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাকে।

{ অতএব কাফির বিশ্বকে তাদের সকল সম্পদকে ঢেলে খরচ করতে দাও, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আরও বড় ও আরও শক্তিশালী জোট গড়তে দাও, এবং তাদের পুরো জাতীয় বাজেটকে মুজাহিদীনদের সাথে লড়াইয়ে উৎসর্গ করতে দাও, কিন্তু ইতিহাসের শক্তিকে অবজ্ঞা করার এই প্রয়াস সব বিফলে যাবে। }

জিহাদের এই ঢেউ যা শুরু হয়েছিল আফগানিস্থানে এবং তারপর ইরাক, শাম ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে তা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের চূড়ান্ত আশা

দশকের পর দশক ধরে শত্রুর কাছে পরাভূত থাকার পর জিহাদই এই উম্মাহর পূনর্জাগরণ ঘটিয়ে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছে। মাত্র তিন দশকের মত অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের স্বঘোষিত দুই পরাশক্তি আফগানিস্থানে মুজাহিদদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছে। আর যাদের অন্তর পশ্চিমাদের বস্তুবাদী উন্নতির দ্বারা অন্ধ তাদের জন্য চিন্তার অনেক খোরাক রয়েছে  পৃথিবীর দরিদ্রতম কিছু মানুষের হাতে প্রযুক্তির জগতে বিশ্বের দুইটি সর্বাধিক উন্নত জাতির (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ন্যাটো) পর্যায়ক্রমিক পরাজয়ের মধ্যে। আর এটা তাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যে উম্মত ইয়ারমুক, ক্বাদিসিয়া ও হিত্বীনে ইতিহাস রচনা করেছিল তারা আজও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। সমানভাবে আমাদের এ আশাও রয়েছে যে, পশ্চিমাদের কূটকৌশল ও আরব বিশ্বে তার পদলেহনকারী থাকার পরও এবং ইরান ও তার মিত্র রাফিযীরা বাশার সরকারকে জনবল ও অর্থের যোগান দিলেও আর যারা নুসাইরীদের থেকে তাদের অস্ত্রের মুখ মুজাহিদদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে তাদের প্রতিবন্ধকতা সত্তেও সিরিয়ার জিহাদ সফলভাবেই তার গন্তব্যে পৌঁছবে। সিরিয়ার জিহাদে এই উম্মতের সফলতা ইনশা-আল্লাহ প্রমাণ করবে যে, ইসলামের চলমান ইতিহাসে আফগানিস্থানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের পরাজয় থেকে তা কম উল্লেখযোগ্য নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় উম্মতের বিজয় মুসলিম বিশ্বে সাফাভিদ (Safavid expansionism) প্রসারণে শুধু মারাত্মক আঘাতই করবেনা বরং তা হবে আমেরিকা, ইরান, রাশিয়া, চীন ও যারা মুসলিমদের সাথে প্রক্সি যুদ্ধে লিপ্ত তাদের জন্য একটি তিক্ত পরাজয়। সর্বোপরি, সেটা হবে আল আকসা বিজয়ের পথে প্রথম ধাপ ও গাজা ও ফিলিস্তিনের অন্যান্য অংশে অবরুদ্ধ আমাদের ভাইদের মুক্তির সূচনা। জিহাদের এই ঢেউ যা শুরু হয়েছিল আফগানিস্থানে এবং তারপর ইরাক, শাম ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে তা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের চূড়ান্ত আশা। জিহাদই ভারত উপমহাদেশে ইসলাম নিয়ে এসেছিল আর এই জিহাদই পাকিস্থান থেকে বাংলাদেশ ও তার বাইরের সাম্রাজ্যবাদকে গুঁড়িয়ে দেবে। আল্লাহ'র নাবী (সাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ আমার উম্মাতের দুই দলকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন; সেই দল যারা আল হিন্দ (উপমহাদেশ) আক্রমণ করবে এবং সেই দল যারা মারিযাম (আঃ) এর পুত্র ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে।" আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আল্লাহ'র নাবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ'র রসুল (সাঃ) আমাদেরকে হিন্দ (উপমহাদেশ) বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি এতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হই, তাহলে আমার মাল ও জানের দুটোই এতে ব্যয় করবো। যদি আমি নিহত হই, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্যতম হবো। আর যদি আমি ফিরে আসি, আমি হবো আবু হুরায়রাহ যে কিনা মুক্ত (জাহান্নাম থেকে)।" আমরা এই উপমহাদেশের আল কায়েদা আজ আফগানিস্থান ও পাকিস্থানে যুদ্ধ করছি আল্লাহর কালেমাকে সর্বোচ্চে স্থান দিতে। "আমরা আশা করি যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আমাদের শহীদ ভাইদের রক্ত কাশ্মীর থেকে আরাকান পর্যন্ত সকল মুসলিমদের স্বাধীনতার পথ সুগম করবে এবং শরীয়াহকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত করবে।"

ইনশা-আল্লাহ্‌ আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারাত প্রতিষ্ঠার সাথেই এই জিহাদ সমাপ্ত হবে না। আমরা আশা করি যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আমাদের শহীদ ভাইদের রক্ত কাশ্মীর থেকে আরাকান পর্যন্ত সকল মুসলিমদের স্বাধীনতার পথ সুগম করবে এবং শরীয়াহকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত করবে।

ইসলামের প্রচার এবং জিহাদের পুনর্জাগরনের একটি প্রয়াস হিসেবে, আস-সাহাব (উপমহাদেশ) চালু করেছে, একটি ম্যাগাজিন যা প্রধানত উপমহাদেশের মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবে, পাশাপাশি ইসলাম এবং মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য বিশ্বের প্রতি মুসলিমকে উজ্জীবিত করবে।

> আমরা আশা করি যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আমাদের শহীদ ভাইদের রক্ত কাশ্মীর থেকে আরাকান পর্যন্ত সকল মুসলিমদের স্বাধীনতার পথ সুগম করবে এবং শরীয়াহকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত করবে
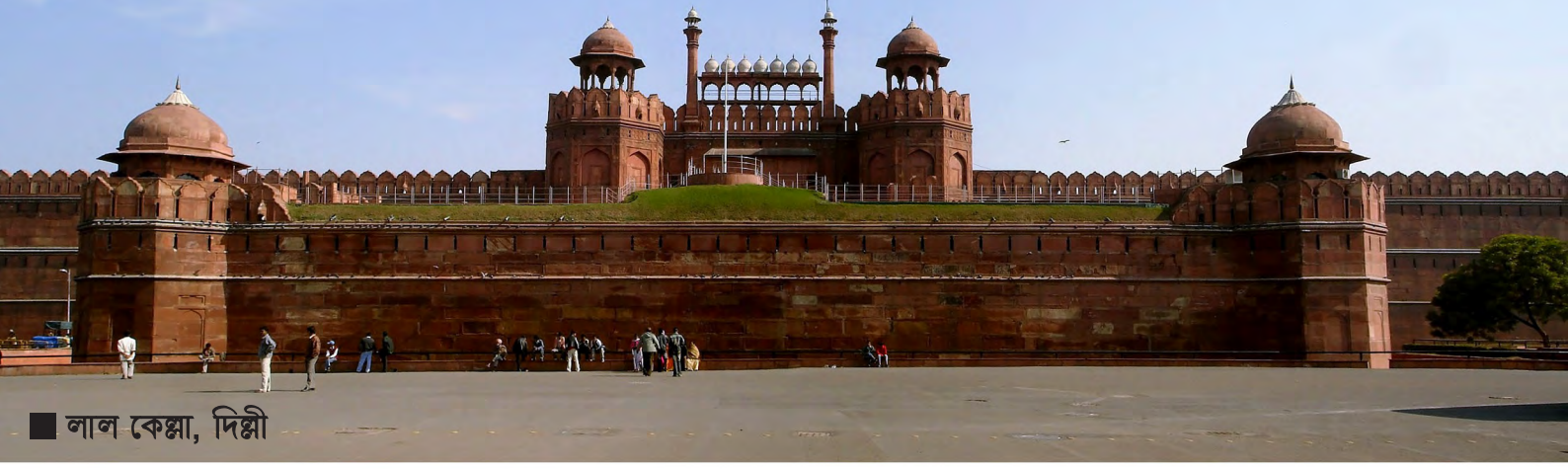
■ লাল কেল্লা, দিল্লী

জিহাদের সঠিক ধারণা তুলে ধরতে এবং মুসলিমদের বিভিন্ন সমসাময়িক সমস্যার সমাধানের সাথে জিহাদের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে এই Resurgence ম্যাগাজিন একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। একই সাথে এটি সেই যুবসমাজের প্রতি এটি একটি আহ্বান, যাদের কাঁধে মানব জাতিকে সত্যের পথে আনার গুরুদায়িত্ব রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই মুসলিম উম্মাহর যুবসমাজ বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী-পুরুষদের একবার নিজের আত্মার অনুসন্ধান করা উচিৎ এবং নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিৎঃ আমরা কি আসলেই নিজেদের শক্তি ও সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি নাকি সমাজের চাপে একটি নিষ্প্রাণ ও অর্থহীন অস্তিত্বের পেছনে ছুটে নিজের কর্মশক্তি অপচয় করছি? এই পৃথিবী থেকে এক বৈচিত্র্যহীন বিদায়ের মধ্য দিয়েই যে ইঁদুর দৌড়ের সমাপ্তি, নিশ্চয়ই তার চেয়েও অর্থবহ কিছু এই জীবনে আছে।

তো আমার প্রিয় ভাইয়েরা; আসুন আমরা এক অর্থবহ জীবন যাপনের চেষ্টা করি যে জীবন এই মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে। আর নিশ্চিতভাবেই, এমন কোন জীবনব্যবস্থা নেই যা জিহাদি জীবনের চেয়েও বেশি অর্থবহ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ।

বিনীত

হাসান ইউসুফ

## ➤ ইতিহাসের পাতা

১৮ই মে ১৯৪৪ এ, ৩২০০০ রাশিয়ান NKVD বাহিনী ক্রিমিয়ার তাতার মুসলিমদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য মাত্র ৩০ মিনিটের সময়সীমা বেঁধে দেয়। প্রায় ২৩৮,৫০০ জন তাতারি মুসলিম গবাদি পশু বহনকারী ট্রেনে করে USSR এর বিভিন্ন প্রশাসনিক শহরে আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। মে ১৯৪৪ থেকে জানুয়ারি ১৯৪৭ এর মধ্যে ১০৯,৯৫৬ (মোট নির্বাসিত ব্যক্তিদের ৪২.৬ শতাংশ) জন অনাহারে ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। রেড আর্মিতে কর্মরত তাতারি এবং নির্বাসিতদের মধ্যে বেঁচে যাওয়া অনেক ব্যক্তিকে সাইবেরিয়া, ইউরাল পর্বত এবং কর্কশ আবহাওয়াপূর্ণ পরিবেশের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান গুলাগসমূহে (জোরপূর্বক পরিচালিত শ্রম শিবির) কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

# ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

অতি সম্প্রতি কাবুলে একটি পাতানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেটা শুধু কাবুলের পুতুল সরকারের মুখোশ উন্মোচন করেনি বরং এটা আমাদের সামনে পশ্চিমা গণতন্ত্রের আসল স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। দখলদাররা এবং তাদের দালালরা আফগান জনগনকে আশ্বস্ত করতে চায় যে একটি গণতান্ত্রিক পরিবর্তন চলছিল। কিন্তু আফগান জাতি শুরু থেকেই সম্পূর্ণভাবে শত্রুদের এমন ফন্দি সম্পর্কে সতর্ক ছিল, যার প্রমাণ তারা দিয়েছেন তাদের পাতানো গণতান্ত্রিক নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে। এখন এটা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে-নির্বাচন পদ্ধতি এবং ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে পরিবর্তনের নীতি কোন সুদূরপ্রসারী সমাধান নয় বরং সেটা হচ্ছে কিছু ফাঁকা বুলির সমষ্টি যাতে লোকদের প্রতারিত করা যায়, এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা, জাতিগত দন্দ্ব, আঞ্চলিক ও ভাষাগত বৈষম্য প্রজ্বলিত করা।

আজ মানুষজন বুঝতে পারছে আমেরিকার পৃষ্টপোষকতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন সাজানো নাটক ছাড়া ভিন্ন কিছু না যার বাস্তবতা দখলদারদের অধীনে অনুষ্ঠিত পূর্বের সমস্ত নির্বাচনের মত। বাস্তবে মূল রাজত্ব এবং কাবুল প্রশাসন এর সমস্ত ক্ষমতা এখনও আমেরিকার হাতে। এসমস্ত দালালদের কাছে দ্বিতীয় কোন বিকল্প নাই, শুধুমাত্র সেগুলা ছাড়া যেগুলাতে তাদের আমেরিকান প্রভুরা হুকুম জারি করে, যদিও সেখানে এদেশের সাধারন জনগনের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। আমরা আমেরিকা এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের কাছে এই বার্তা পৌছে দিতে চাই যে, তোমরা যদি আফগানিস্তানে সেনা মোতায়েন অথবা স্থায়ী সামরিক বেস এজন্য প্রতিষ্টা করতে চাও যে, এগুলো তাদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাবিধায়ক হিসেবে সাহায্য করবে তাহলে তোমাদের উচিত হবে আফগান জনগণকে বিষয়টা তাদের উপর ন্যস্ত করা যাতে তারা জাতীয় ঐক্য ও ধর্মীয় মূল নীতির আলোকে একটা স্বাধীন ইসলামিক ইমারত প্রতিষ্টা করতে পারে। কিন্তু আসল কাহিনী হল তোমরা অন্যায়ভাবে এবং মানবতা লঙ্ঘন করে তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছ। এটা সুনিশ্চিত যে তোমাদের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন অপরাধ সমুহের জবাব এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে না যা তোমরা বিগত তের বৎসর ধরে আমাদের কাছে ভোগ করে এসেছ। সম্ভবত তোমাদের এখন বোঝা উচিত যে আফগান জনগনের জিহাদের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ, তারা বরাবর তাদের স্বাধীনতা রক্ষা এবং ধর্মের জন্য লড়াই করেছে। এই জাতি কখনো অপদস্ত হতে চাইবে না এবং তোমাদের পুতুল সরকার ব্যবস্থাকেও মেনে নিবে না।

আমরা বিশ্বাস করি আফগানিস্তানের জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত থামবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত দখলদার সৈন্যরা এদেশ থেকে প্রস্থান করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি স্বাধীন ইসলামিক সরকার আফগানিস্তানে প্রতিষ্টিত হয়। যেকোন ধরনের অজুহাত হোক না কেন, যদিও খুব অল্প সংখ্যক দখলদার বাহিনী উপস্থিত থাকে তা সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। পরিস্তিতি যাই হোক দখলদারিত্বকে দীর্ঘ করতে যেকোন পদক্ষেপ নাও না কেন তা কখনো গ্রহনযোগ্য হবে না।

আমরা তাদেরকে সতর্ক করতে চাই যারা আগ্রাসী শক্তিসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দখলদারিত্ব ও যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চায়। দখলদার বাহিনীর ক্রমাগত উপস্থিতি কারো স্বার্থে নয়। যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তাহলে এই দেশের এবং অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবনতি ঘটবে। এটা আফগানিস্তানে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিলম্বিত করবে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হবে এবং দেশকে বিভক্ত করে রাখবে, পাশাপাশি শত্রুদের মতাদর্শগত বিস্তৃতি এবং যুদ্ধের সংস্কৃতি আগামী প্রজন্মকে হুমকির মুখে ঠেলে দিবে।

আমরা ফিলিস্তিনের জনসাধারনের প্রতি ইসরাইলের এমন সব বর্বর আগ্রাসনের নিন্দা ও সমালোচনা করছি, যাদের অনেকেই তাদের দ্বারা নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে, অনেকেই হতাহত হয়েছে, হাজারেরও বেশী লোক ঘর ছাড়া হয়েছে গত মহিমান্বিত রমজান মাসেই। আমরা সমস্ত বিশ্বকে আহ্বান করছি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে, যাতে তারা এই আগ্রাসনের মুখে, কুলুপ এটে না বসে, তাদের এই বর্বর আগ্রাসনের কাছে নতি স্বীকার করা হল অন্যায় এবং এর অর্থ হবে - সবাই পরাজিত হয়েছে । এ সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য জরুরি ও বাস্তবিক কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে এই জুলুম বন্ধ করা যায়, ক্রমাগত আগ্রাসন এই অঞ্চলের এবং বিশ্ববাসীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলে দিবে।

**আমীরুল মু'মিনিন**
**মোল্লা মোহাম্মদ উমর মুজাহিদ**

(ঈদ-উল-ফিতর এর বার্তা থেকে একটি উদ্ধৃতি- ১৪৩৫ হি:)

উৎস: শাহামাত ইংলিশ (অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান)

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৪।

**উসামা মাহমুদ (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)**
মুখপাত্র, আল কায়েদা উপমহাদেশ।

## উপমহাদেশীয় আল কায়েদা

# আমেরিকান নৌবহরের উপর মুজাহিদীনদের দ্বারা পরিচালিত অপারেশন

কারণসমূহ ও উদ্দেশ্য

---

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। একমাত্র তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল সাঃ এর উপর।

উপমহাদেশীয় আল কায়েদা - আল কায়েদার নতুন শাখা - আল্লাহর রহমতে আমেরিকান মিলিটারি ও সমুদ্রপথসমূহে তার মিত্রদের লক্ষ্য করে একটি দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী পরিকল্পনা করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মুজাহিদীনদেরকে এই অপারেশনের জন্য পরিচালিত করেছেন ও সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তাদের মুখপাত্র 'আইএসপিআর' (ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স) এর মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবেই এই হামলার প্রকৃতি ও মূল লক্ষ্যবস্তুকে গোপন রাখতে চেষ্টা করছে। আমেরিকান পক্ষপাতনীতির ব্যর্থতা ঢাকতে ও বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে আইএসপিআর ও পাকিস্তান নৌবাহিনীর মুখপাত্র এই হামলাকে শুধুমাত্র পাকিস্তান নৌবাহিনীর উপর, বিশেষত করাচি নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ডের উপর হামলা বলে উপস্থাপন করে। অথচ বাস্তবতা হল, হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত আমেরিকান নৌবহর। আর সেখানে হামলা করা হয় পাকিস্থানী যুদ্ধজাহাজ, ফ্রিগেট, পিএনএস জুলফিকার ব্যবহার করে। তাছাড়া আক্রমণকারীদের বর্ণনা করা হয় বহিরাগত হিসেবে যারা একটি পাকিস্তানী নৌস্থাপনায় প্রবেশ করে। অথচ দুর্দান্ত এই হামলায় অংশগ্রহণকারী সকলেই ছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর কমিশন্ড অফিসার।

আমরা সেই সকল অফিসারদের ঈমান ও সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কিতাব চিন্তাভাবনার সাথে পড়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন। তারা জিহাদের ময়দানের বিজ্ঞদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ওয়াজিব আদায়ের জন্য মুজাহিদীনদের কাতারে শামিল হয়েছিলেন।

সেই সকল অফিসাররা পদোন্নতি ও সুবিধা লাভের সস্তা খেলায় অংশ নিতে অসম্মতি জানান এবং তার পরিবর্তে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে বেছে নেন।

এটা শুধু আমেরিকানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন হামলা ছিলনা অধিকন্তু এটা ছিল পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কর্মরত অফিসারদের দ্বারা আমেরিকার প্রতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চরম আনুগত্য ও গোলামীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। আল্লাহর অশেষ রহমতে এই বিদ্রোহ ছিল ভঙ্গুর কাঠামো বিশিষ্ট পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রথম প্রকাশ্য বিভাজন আর ইনশা আল্লাহ এটাই শেষ এমনটি হবে না। আঞ্চলিক জলসীমায় আমেরিকার নৌ সক্ষমতায় আঘাত হানার সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে ঐসকল অফিসাররা সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীতে কর্মরত সকলকে যাদের অন্তরে এখনও নামমাত্র ঈমানের ছায়াটুকুও রয়েছে একটি মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর আনুগত্য করাও তাঁর দ্বীনের জন্য কাজ করা আমেরিকার জন্য কাজ করতে তাদের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের আদেশের চেয়ে অধিক অগ্রবর্তী। এই বিদ্রোহ ঐ সকল অফিসার ও সৈনিকদের আমেরিকার প্রতি স্বেচ্ছাকৃত গোলামীর বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, যারা বছরের পর বছর ধরে আমেরিকা পন্থী নীতির বিরুদ্ধে তাদের তিক্ত অনিচ্ছাকে দমন করে রেখেছেন। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে কুফরের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবস্থার প্রতিরক্ষার্থে তাদের জীবন নষ্ট না করে ইসলাম রক্ষার্থে তাদের রক্ত বিলিয়ে দিতে।

## আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর কারণসমূহ

উপমহাদেশীয় আল কায়েদা আমেরিকাকে তার প্রাথমিক শত্রু ও তার সামরিক সক্ষমতাকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে শহীদ শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর পদ্ধতির অনুসরণ করে। এর কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

- আমেরিকা ইসলামকে তার প্রাথমিক শত্রু বলে মনে করে এবং তার ভিত্তির অস্তিত্বের জন্য হুমকি মনে করে। সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরতিহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, যা বিগত দুই দশকে চরমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকা এমন প্রত্যেক ইসলামি আন্দোলনকে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের ধ্বংস করাকে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে।

- আমেরিকা ইসরাঈলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং এই দুর্নীতিবাজ, জুলুম-নির্যাতনকারী ইহুদি অস্তিত্বের টিকে থাকার প্রধান কারণ। গাজা ও ফিলিস্তিনের অন্যান্য অংশে আমাদের ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি জুলুমের জন্য আমেরিকা সমানভাবে দায়ী।

- সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, মালি, বার্মা, বাংলাদেশ, আফগানিস্থান, ভারত ও ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য অংশে মুসলমানদের রক্ত ঝরানোর জন্য দায়ী আমেরিকা।

- একইভাবে, এই অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের দুর্দশা, নিপীড়ন, জুলুম ও দরিদ্রতার জন্যও দায়ী হচ্ছে আমেরিকা। আধুনিক ঔপনিবেশিকতার এই যুগে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী শাসক ও তাগুত সেনাবাহিনীর মাধ্যমে উপনিবেশ তৈরি করে রেখেছে। এই সব পুতুল শাসকদের ব্যবহার করে আমেরিকা মুসলিম উম্মাহর ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় আর সেখানে অধিকাংশ মুসলমান চরম দরিদ্রতার মধ্যে বাস করে।

- মুসলমান জনসাধারণের ধর্মকে ধ্বংস করতে মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষবাদ) ও ধর্মত্যাগকে ছড়িয়ে দিতে যে সকল ব্যক্তি, আন্দোলন ও সংস্থাসমূহ কাজ করে আমেরিকা তাদের সমর্থন ও রক্ষা করে।

## কেন নৌঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল?

- নৌশক্তির কারণেই আমেরিকা ও তার মিত্ররা মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে মক্কা ও মদিনায় একটি সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ কঠোরভাবে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকার নৌ ও সামরিক সক্ষমতাই বিশ্বব্যাপী তার নির্যাতনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। আমেরিকা তার সাতটি নৌশক্তি দিয়েই বিশ্বের সাগর ও মহাসাগরগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এভাবেই সে মুসলিম বিশ্বের সমুদ্র উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ ও প্রণালীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং উম্মাহর সম্পদ লুট করে নিচ্ছে। আর সেই একই সম্পদই সে মুসলিম বিশ্বে তার আগ্রাসনকে স্থায়ী করতে ব্যবহার করছে।

- আমেরিকান নৌঘাঁটি সমূহ থেকেই জেট-বিমানসমূহ ছোঁড়া হয় যা আফগানিস্থান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বঞ্চিত মানুষের মৃত্যুর বন্যা তৈরি করে এবং ধ্বংস সাধন করে। আর এই নৌশক্তি ব্যবহার করেই ক্রুসেডার সেনাবাহিনী যারা ইমারাতে ইসলামি আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের লজিস্টিক সমর্থন দেওয়া হয়।

আর তাই আমরা আমেরিকাকে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ও ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈলের প্রতি এবং মুসলিম জনসাধারণের উপর জোর করে আসা মুরতাদ সরকারদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে, মেজর নিদাল হাসানের মত ও পাকিস্তান নৌবাহিনীর ঐসকল অফিসারদের মত আল্লাহর এমন অনুগত বান্দারা তোমাদের ও তোমাদের মিত্রদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে থাকবে তোমাদের নিকৃষ্ট সব দুঃস্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

“**আল্লাহ্ তাঁর কাজকর্মে সর্বেসর্বা, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।**” ( সুরা ইউসুফ, আয়াত ২১)

এই অপারেশনের আরও বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ আগামীতে প্রকাশিত হবে।

সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামগণের উপর বর্ষিত হোক শান্তি ও রহমত।

# প্রেক্ষাপট

৯০°

"দুর্ভাগ্যক্রমে, আরব নেতৃবৃন্দ হলেন কপটতা এবং ধূর্ততার মহানায়ক। তাঁরা মানুষের সামনে আসেন এবং বলেন, 'ফিলিস্তিন মুক্ত করতে হবে, ইসরাইল ধ্বংস করতে হবে, আমরা ইসরাইলী উপনিবেশ থামাতে চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যখন তাঁরা তাদের পশ্চিমা এবং আমেরিকান বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁরা পুরো বিপরীত কথা বলেন। তাঁরা তাঁদের বলেন...একে অবরোধ করুন, এটিকে ধ্বংস করুন...। এটি আমাদের জন্য সুখের দিন যে, আমরা আমাদের নেতাদের বাস্তব অবস্থা দেখতে পাচ্ছি।"

আব্দুল বারী আতওয়ান
(আল-হিওয়ার)

"আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলো- আমেরিকা, পশ্চিমা এবং প্রত্যেকেই বাশার আল-আসাদের অপসারণের ব্যাপারে মোটেও গুরুত্বারোপ করে না। আমি এই ব্যাপার নিয়ে রবার্ট ফোর্ড এর সাথে দৃঢ়তার সহিত কথা বলেছি। এছাড়াও, আমি তাকে এটিও বলেছি যে আমেরিকানরা বাশার আল-আসাদকে সাহায্য/সমর্থন করছে। তারা চাচ্ছে এই যুদ্ধকে যতটুকু সম্ভব সম্প্রসারণ করতে, যতক্ষণ না সিরিয়া পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।"

কর্নেল আব্দুল জব্বার আকিদি
(প্রাক্তন প্রধান, আলেপ্পো সামরিক পরিষদ)

"দিন দিন চিন্তাবিদগণ সামরিক শাখায় অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিণত হচ্ছেন। এর কারণ হল সামরিক বিভাগগুলোতে প্রচুর পরিমাণে চিন্তাভাবনার বা গবেষণার উদয় হচ্ছে। এই চিন্তাভাবনাই পেন্টাগনের অতিউচ্চ বাজেটের কারণ।"

উইলিয়াম হারটাং,
কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক নীতি বিভাগ
(জনগণ ও শক্তি, আমেরিকাস ওয়ার গেম)

রবার্ট গ্রেনিয়ার,
সাবেক প্রধান সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ, CIA

"৯/১১ এর পর আমরা যে অবস্থায় ছিলাম এখনও আমরা সে অবস্থায় রয়েছি। শুনতে খারাপ লাগলেও এটি সত্য যে, গত ১২ বছরে আমাদের অগ্রগতি খুব সামান্যই রেখাঙ্কিত করতে পেরেছে, কিন্তু আমরা সেখানেই আছি।"

"আমি আমার নিরাপত্তার ভয় করি না। আমি জানি তারা আমাকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমি একজন মুসলিম; একজন সত্যিকার মুসলিম। আমি বিশ্বাস করি আমার জীবন ও মরণ আল্লাহর হাতে। আমার মৃত্যু সেদিনই হবে যেইদিন আল্লাহ আমার জন্য তা নির্ধারণ করে রেখেছেন, এর আগেও না অথবা পরেও না।"

শায়খ আবু বাকার শরীফ আহমাদ রঙ্গু
সোমালিয়ান জিহাদকে সমর্থনের কারণে
কেনিয়ান স্পেশাল ফোর্স তাঁকে শহীদ করে

**ক্লাউস অগাস্টিনাস** (ড্যানিশ আর্মি), আফগান সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষক (এন আর্মি প্রিপেয়ারস)

"এটি ছিল বড় ধরণের একটি প্রভাব এর কারণ হল আমার বিবেচনায় ছিল যে আমি ৭ মাস ধরে এখানে দুর্দশার মধ্যে আছি এবং আমি বাড়িতে যেতে চাচ্ছিলাম আমার পরিবার ও আত্মীয়দের নিকট। কেননা সকল গ্রীন-অন-ব্লু এর দরুন আমি আমার ছাত্রদের নিকট যেতে পারছিলাম না। যখন আমি তাদের কারো কাছে যেতাম, (তখন আমার নিজের মনে প্রশ্ন জাগত) এই কি সেই যে আমাকে হত্যা করবে?"

"এখন, যখন আমার প্রয়োজন আমার সরকারের, মনে হচ্ছে যেন আমাকে তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে এবং ভুলে গেছে। এখন তুমি(ওবামা) দ্বিতীয়বারের মত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, এবং এর মানে হল যদি তুমি চাও তাহলে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পার, কারণ হল তোমার এখন পুনঃনির্বাচনে যাওয়ার কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না। এবং আমি আবারো তোমার নিকট আবেদন করছি আমার মুক্তির ব্যাপারে তোমার কর্মকর্তাদের আদেশ করার।"

**ওয়ারেন উইন্সটেইন,** একজন আমেরিকান যুদ্ধবন্দি (আস-সাহাব মিডিয়া)

**ড. আব্দুল্লাহ নাফিসি** (আল ইয়াওম টিভিতে বলেছেন)

"ইসরাইল কিছু একটার জন্য খুব গভীর ভাবে কৌতুহলী যা অত্যন্ত ভয়ানকঃ তারা ইরানের দিকে ফিরেছে, প্রকাশ্যে একে কৌশলগত শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছে, কিন্তু ভিতরে একটি কৌশলী মিত্র। ইরান এবং ইসরাইল অভিন্ন কৌশলগত সঙ্কটের সামনে। ইরান এবং ইসরাইল উভয়রই তাঁদের আরব প্রতিবেশীদের তুলনায় সামরিক শক্তি বেশী। যার কারণে, এই দুটি দেশ হল আধিপত্যবাদী। তুমি লক্ষ্য করবে যে, ইরান আহওয়ায দখল করেছে, যার আয়তন হল এক লক্ষ ষাট হাজার বর্গকিলোমিটার...(দ্রষ্টব্যঃ ফিলিস্তিন থেকে আট গুন বড়)। আমরা ফিলিস্তিনের জন্য কান্না করছি... ফিলিস্তিনের জন্য ষাট বছর ধরে! কিন্তু শক্তিমানরা আরব ভূমি দখল করছে, এমনকি ইসরাইল থেকেও বেশী, এটি হচ্ছে ইরান যারা তাদের শক্তি আহওয়ায দখল করতে ব্যায় করছে।"

**নাদান ফ্রিড ওয়েসলার,** আমেরিকান সিভিল লিবারেশন ইউনিয়ন (অ্যাটাক আব দা ড্রোনস)

"যুক্তরাষ্ট্র দাবী করে তাদের ড্রোনগুলো পুরো বিশ্বের যেকোনো জায়গায় হামলা করতে সক্ষম। আমি আশঙ্কা করি যে, যুক্তরাষ্ট্র খুব বেশী খুশি হবে না যদি রাশিয়া, চায়না অথবা ইরান এর মত কোন একটি দেশ সমান কর্তৃত্ব দাবী করে এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের জনগণের বিরুদ্ধে লেগে যায়। সত্যিকার অর্থে এটি একটি ভয়ানক নিদর্শন।"

# প্রেক্ষাপট

আজকের নসীহ

- মুমিনরা কথা বলে অল্প কিন্তু কাজ করে বেশি...
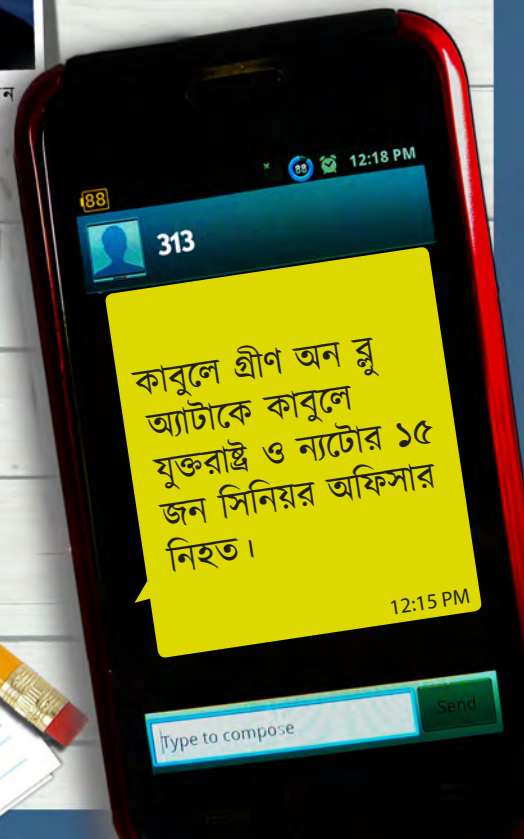
**মুহাম্মাদ সাঈদ ইসমাইল,** মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্ট মুসলিম নেতা

"মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে ৩৫০টির বেশী মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং পায়ের নিচে পদদলিত করা হয়েছে। শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের হত্যা করা হয়েছে; একই সময়ে বধ করা হয়েছে; তাদের শরীরকে চাপাতি দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। লোকদের জ্যান্ত পুড়ানো হয়েছে। ফরাসী বাহিনী মুসলিমদের নিরস্ত্র করেছে, আর এন্টি-বালাকা বাহিনী সেই মুসলিমদের এসে হত্যা করেছে। এটি একটি ষড়যন্ত্র যা মধ্য আফ্রিকায় চালানো হয়েছে।"

আমি একটি বিষয় নিয়ে এখন ভাবতে শুরু করেছি যে, সেই সব রেখাসমূহ যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মি. সায়কস এবং মি. পিকট দ্বারা অঙ্কিত করা হয়েছিল, যেভাবেই হোক তারা করেছিলেন। কিন্তু এর (সিরিয়ার জিহাদ) শেষে হয়ত আমরা দেখব যে ঐ রেখাগুলো আর নেই।

**মিকাইল হায়ডেন,** প্রাক্তন পরিচালক NSA (২০০৬-০৯), সিরিয়ার এবং CIA এর পরিচালক (২০০৬-০৯), সিরিয়ার জিহাদ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন

**শাহজাদ মির্জা আকবার,** পাকিস্তানের মানবাধিকার সংস্থার আইনজীবী (ওয়াজিরিস্তানে আমেরিকার ড্রোন হামলার বিষয়ে, রাশিয়া টুডে)

"আমি এটিকে কেবল একটি বন্দি-শিবির ছাড়া অন্য কিছু বলব না। তোমরা একটি সামরিক দেয়াল নির্মাণ করেছ এবং এই দেয়ালের ভিতরে আশি লক্ষ জনগণ রয়েছে যাদের জন্য অনুমতি নেই দেয়ালের বাইরে আসার এবং দেশের কেউই সেই দেয়ালের ভিতর যেতে পারবে না। আর এটি হল এক ধরণের পরীক্ষাগার যা আমেরিকানরা তাদের ড্রোন কার্যক্রম চালাতে ব্যবহার করছে।"

"রামসফেল্ড খুব ভালোভাবে জানত তাকে অফিস থেকে বের হতে হবে এবং এই প্রশ্নের জওয়াব সে দিতে পারবে না। তাদের সাথে আমরা কী করব? একজন আমেরিকান নাগরিক হিসেবে যে একজন ভীরু নয়, আমার তো ইচ্ছা তাঁদের প্রত্যেককে আগামীকাল সকালে মুক্ত করে দিব এবং আবারো তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি করাব যদি তা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু এখনকার দিনে এই দেশে আমরা প্রচুর কাপুরুষ লালন-পালন করছি।"

**কোল লরেন্স উইলকারসন**
প্রাক্তন চীফ অব স্ট্যাফ (লাইফ আফটার গুয়ান্তানামো)

প্রেক্ষাপট

কেন্দ্র বিন্দুতে

■ পাকিস্তান

এই দেশে 'জাতীয় নিরাপত্তার' নামে সাম্প্রতিক সময়ে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার কারণে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং নিজের দেশেই তারা উদ্বাস্তুতে পরিনত হয়েছে। এই অপমানজনক নির্বাসন এড়াতে অনেকে প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে চলে গিয়েছে; যা ছিল তুলনামূলক সম্মানজনক। এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে নওয়াজ শরিফের সরকারের নিষ্ঠুর উদাসীনতার সাথে তুলনা করলে অবশ্য কারজাইয়ের পুতুল সরকারের 'মানবিক উদ্বেগ' কে ভালোই বলতে হয়।

বিদেশী শত্রুরাও যেখানে আক্রান্ত দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি দেখায় সেখানে পাকিস্তান আর্মি হাজার হাজার দরিদ্র মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয়ার জন্য মাত্র তিন দিন সময় দিয়েছিল। অনেকেই পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহন না থাকার কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া এই কারফিউ এর কারণে অভিযানের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই ব্যাপক জ্বালানী ঘাটতি তৈরি হয়। হৃদয় বিদারক দৃশ্যগুলি সোয়াত উপত্যকার অনেক স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। ডজন ডজন নারী, শিশু কে ট্রাক্টর পরিচালিত লরিতে উঠানো হয় যেগুলো পশু বহনের কাজে ব্যবহার করা হয়। মরিয়া হয়ে অনেক নারী, শিশু, প্রাপ্ত বয়স্কদের শস্যের মত গাদাগাদি করে ট্রাকের পিছনে উঠানো হয়। অসংখ্য পরিবার পায়ে হেটে আফগানিস্তান পৌঁছায়। এ সময়ে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মানুষও পাকিস্তান আর্মির 'যান্ত্রিক শৃঙ্খলা' প্রত্যক্ষ করে। খোস্তে গোলাম খান বর্ডারের দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে তা বন্ধ ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বাইরে শুধুমাত্র একটি রুট অনুমদিত ছিল। খাজুরি এবং বাক্কাখেলে জবরদস্তিমূলক চেকিং, পরিচয় শনাক্তকরন এবং রেজিস্ট্রেশনের কষ্টকর প্রক্রিয়া এবং বানুর তীব্র গরমে উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন- এ সবকিছুই তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নমুনা। ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা যেমন মীর আলি, মিরান শাহ দাত্তাখেলের মানুষদের যানবাহন ও জ্বালানীর এই তীব্র সংকটের মধ্যে 'নিরাপদ স্থানে' সরে যাওয়ার জন্য মাত্র এক দিন সময় দেয়া হয়। এটা নিশ্চিত, এই অপমানজনক আচরণ এখানকার স্বাধীনচেতা মানুষের মনে বিরাট প্রভাব ফেলবে এবং তারা সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকবে যেদিন তারা আর্মিকে এক সমুচিত জবাব দিতে পারে।

এই অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট আর তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনঃ পাকিস্তান আর্মির প্রভুরা যাতে আফগানিস্তান থেকে নিরাপদে সরে যেতে পারে এই জন্য গোলাম খান-বানু হাইওয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি ছিল। ক্রিমিয়া সংকট কে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সাথে নতুন করে শুরু হওয়া উত্তেজনার কারণে 'নর্দান ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক' নামে পরিচিত সাপ্লাই রুটটি আমেরিকার আফগানিস্তান থেকে কেটে পড়ার জন্য আর নিরাপদ নয়। তাই আমেরিকা তাদের পাকিস্তানি দালালদের উপর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে অপারেশন চালানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে যাতে অন্তত বয়া এবং মীর আলির মধ্যকার জায়গা 'শত্রুমুক্ত' থাকে।

দিন যত যাচ্ছে এ বিষয়টা ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, এই অভিযানটি ছিল আমেরিকার পালিয়ে বাচার সর্বশেষ প্রচেষ্টা। আফগানিস্তানের শোচনীয় পরাজয়কে 'ওয়াজিরিস্তান বিজয়' দ্বারা ধামা-চাপা দিতে আমেরিকা তাদের প্রতিনিধি পাকিস্তানকে এ কাজে সব রকমের সহায়তা করেছে। আমেরিকান ড্রোন এবং পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অবিরতভাবে পাকিস্তানের আকাশসীমার মাঝে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে হামলা চালিয়েছে আমেরিকান জঙ্গি বিমান কিন্তু তার দায় নিয়েছে ISPR.

আমেরিকা এবং তাদের পাকিস্তানি ভৃত্যদের বেপরোয়া ভাব আসলে আমেরিকা

ও তার দোসরদের পরাজয়ের আরেকটা প্রমাণ; যা তাদের ভাগ্যে ওইদিনই নির্ধারিত হয়েছিল যেদিন তারা আফগানিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

পরাজিতদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ক্রমাগত লক্ষ্য পরিবর্তন করতে থাকে এবং তাদের উদ্দেশ্য প্রতি মুহূর্তে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে থাকে। আফগানিস্তান যুদ্ধের ক্ষেত্রে বলতে হয়, তাদের গলাবাজিতে আগের মত জোর নেই এবং তাদের মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তালেবান সরকারকে উৎখাত করা এবং আল-কায়েদাকে পরাজিত করা। তালেবানরা যখন কাবুল এবং অন্যান্য শহর ছেড়ে দিল তখন আর আমেরিকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা লুকিয়ে থাকলো না। তাদের পরিকল্পনার প্রসার ঘটল এবং বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্দেশ্য যেমনঃ 'জাতি পুনর্গঠন' এবং একটি শক্তিশালী আফগান 'ন্যাশনাল' আর্মি গঠনে মনোযোগ দিল। এ সর্বনাশা সিদ্ধান্তের কারণে আমেরিকান সরকার আজ নিজেদের মুখ-রক্ষায় এতটাই ব্যাস্ত যে তারা পৃথিবীর মানুষকে বুঝ দিতে চায় তাদের দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আল-কায়েদার নেতাকে হত্যা করা।

পাকিস্তানের তথাকথিত 'প্রতিরক্ষা' বাহিনী উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তির উপর অনবরত কামানের গোলা বর্ষণ ও বর্বরোচিত বিমান হামলা করে ক্ষয়ক্ষতি করা ছাড়া আর তেমন কিছুই অর্জন করতে পারেনি। আল্লাহর ইচ্ছায় অধিকাংশ মুজাহিদ মীর আলি, মিরানশাহ এবং দেগন থেকে নিরাপদে আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরে গেছেন। একটি দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ উত্তর ওয়াজিরিস্তানে আর্মির জন্য অপেক্ষা করছে ইনশা আল্লাহ।

সেনাবাহিনীর 'উল্লেখযোগ্য সাফল্য' এর বিপরীতে এখন পর্যন্ত যুদ্ধে খুব অল্প সংখ্যক মুজাহিদই আসলে তাদের হাতে শহীদ হয়েছেন। ইতিমধ্যে মীর আলি, মিরানশাহ এবং দেগনে বিভিন্ন গেরিলা আক্রমনে আর্মি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিশেষ করে, জুনের তৃতীয় সপ্তাহে সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরে হামলায় তাদের পাঁচটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং পনেরো জন সৈন্য নিহত হয়েছে। জুলাইয়ের ৫ তারিখ হামজনি ও সাইদগাইতে সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরে ২ টি হামলা হয়, ৩৭ জন সৈন্য খতম। এছাড়াও সেনাবাহিনী মিরানশাহ এবং মীর আলিতে IED (improvised explosive device) দ্বারা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির স্বীকার হয়। পাশাপাশি তারা বয়া ক্যাম্পে মর্টার আক্রমণ, মিরানশাহ, দাত্তাখেল, খারকামারের আর্মি ক্যাম্প/পোস্টগুলোতে ক্রমাগত মিসাইল আক্রমণ এবং সাম্প্রতিক সময়ে তারা দাত্তাখেল বাজারে দাঙ্গার শিকার হয় যার ফলে তাদের বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য খতম হয়। আর্মি এখন পর্যন্ত মুজাহিদদের সাথে মুখোমুখি সংঘাত এড়িয়ে যাচ্ছে। সামরিক কৌশল এর চেয়ে এরা মূলত রাজনৈতিক কূটকৌশলের উপর নির্ভরশীল; যার মাঝে আছে- গোত্রগুলোর মাঝে ঐতিহাসিক গোত্রীয় বিভেদ উসকে দিয়ে এক গোত্রকে আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়া এবং স্থানীয় কিছু গ্রুপকে নেতৃত্বের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের প্রতি অনুগত থাকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে কিনে নেয়া।

যাই হোক, রাহিল শরীফ এবং তার ভাড়াটে সৈন্যদের এটা জানা থাকা দরকার যে, ময়দানে কুফফারদের সাথে তাদের সহাবস্থান যা আফগানিস্তানে জেনারেল ডেভিড প্যাট্রিয়াসের মস্তিষ্ক প্রসূত পদ্বতি থেকেও বিশেষজ্ঞদের নিকট ব্যর্থ প্রমানিত হবে। যেখানে ৪০টিরও বেশি দেশের প্রশিক্ষন প্রাপ্ত প্রফেশনাল ও ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আর্মি ব্যর্থ হয়েছে সেখানে ৩/৪ ডিভিশনের মানবিক মূল্যবোধ শুন্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিচালিত ভাড়াটে সৈন্যরা জান নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। সেনা বাহিনী কখন ও কোথায় যুদ্ধ শুরু করবে সেই ফয়সালা করে ফেলেছে, কিন্তু যুদ্ধ কখন শেষ হবে সেটার সিদ্ধান্ত নেয়াটা তাদের নাগালের বাইরে.....
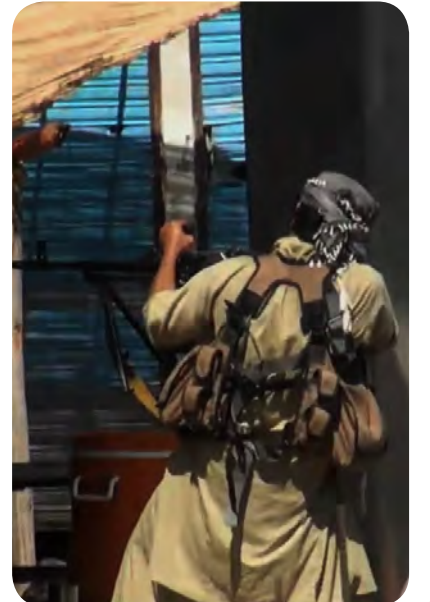
## ভারত

### গণতন্ত্র ও ক্ষমতায়ন...

গণতন্ত্রের একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে যা প্রায়ই আমাদের প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হয়; আর তা হচ্ছে এটা সবচেয়ে খারাপ মানুষটাকেই ক্ষমতায় আনে! বলতে গেলে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি বার বার ঘটছে। গণতন্ত্রের ফসল বলতেই আমাদের সামনে চলে আসে জর্জ ডব্লিউ বুশ এর মত নির্বোধ লোক, নিকলাস সারকজির মত কামুক এবং এরিয়েল শ্যারন এর মত জালিম, খুনিদের কথা। এ ঘটনাগুলোরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচিত করেছে নরেন্দ্র মোদীর মত এক চরম হিন্দুবাদী ও গণহত্যাকারীকে যা মোটেই অবাক হওয়ার মত বিষয় নয়। ও হ্যা! হিটলারও কিন্তু নির্বাচিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়!

## মুজাফফরনগর

### ভারতের 'চিনির গুদামে' চরম দারিদ্রতা...

মুজাফফারনগর পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি জেলা যা ভারতের 'চিনির গুদাম' নামে পরিচিত এর কৃষিজ পণ্যের প্রাচুর্যতার কারণে। গত বছর জেলাটি ভারতে সর্বশেষ মুসলিম নিধনের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা, শতশত মানুষকে পঙ্গু করা হয়েছে এবং মুসলিমদের জায়গা-সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ৪২০০০ মানুষ বাড়ি ছাড়া হয়েছে যাদের অধিকাংশ চরম দারিদ্রতা ও নিরাপত্তাহীনতার মাঝে শামিল ও মুজাফফারনগরের উদ্বাস্তু শিবিরে দিন কাটাচ্ছে। তীব্র শীতে উদ্বাস্তু শিবিরে পর্যাপ্ত পরিমাণ শীত বস্ত্র ও খাদ্যের অভাবে কয়েক ডজন শিশু ও বৃদ্ধ মারা গিয়েছে। তীব্র গরমের সময় ক্যাম্পের মানুষরা এক কঠিন সময় পার করে।

## কেরালা

### ব্রাহ্মণদের ফুলে-ফেঁপে উঠা ও ভারতের জাতিবিদ্বেষ...

ভারতের কেরালার ত্রিভান্দ্রামে এক হিন্দু মন্দির থেকে ২২ বিলিওন ডলারের সমমূল্যের এক গুপ্তধন উদ্ধার হয় যা শত শত বছর ধরে মন্দিরের কোষাগার গুলোতে লুকানো ছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভারতের ব্রাহ্মণরা কি পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী। এই গুপ্তধন উদ্ধার হয় ১৬ শতাব্দীর পদ্মানাভূস্বামী মন্দির থেকে। স্বর্ণের মূর্তি যা হীরা, রুবি ও মূল্যবান পাথর দ্বারা খচিত ছিল, মুকুট, গলার হার এবং স্বর্ণ ও রুপার মুদ্রা এই মন্দির হতে উদ্ধার হয়। স্বর্ণ ও রুপার মুদ্রাগুলোর ওজন এতো বেশি ছিল যে তদন্তকারীদের তা পরীক্ষা করার জন্য গণনা করার পরিবর্তে বস্তাভর্তি করে ওজন করতে হয়েছে।

ভারতে কমপক্ষে ১ মিলিয়ন মন্দির আছে যেগুলো লক্ষ লক্ষ একর কৃষি জমি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং জায়গা-জমি দখল করে আছে যার মূল্য প্রায় বিলিয়ন ডলার। এই সম্পত্তির প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছে কাগজে কলমে যদিও মন্দির, কিন্তু নাটের গুরু হল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। মন্দিরে এই অনুদান আসে মূলত হিন্দু সম্প্রদায় থেকে, যেখানে কি না অধিকাংশ হল নিম্ন বর্ণের শুদ্র সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণরা ভারতের জনসংখ্যার ৫%, এরাই বাকি ৯৫% জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যখন দক্ষিন আফ্রিকায় ১৫% শ্বেতাঙ্গ ৮৫% কৃষ্ণাঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন সেটা হয় বর্ণবাদ। কিন্তু ধনশালী ৫% নাপাক ব্রাহ্মণরা যখন সংখ্যায় এক বিলিয়নেরও বেশি ৯৫% জনগোষ্ঠীর উপর চেপে থাকে তখন সেটা হয় 'গণতন্ত্র' এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত!

## বাংলাদেশ

বি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যে প্লাবন বাংলাদেশে শুরু হয়েছে তা আগের মতই অব্যাহত আছে। জানুয়ারি থেকে শুরু করে এই বছর ১৩৮ জনেরও বেশি মানুষ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর হিসাব মতে অন্তত ১৭৯ জন মানুষ ২০১৩ সালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে, যদিও জামাত-ইসলামের দাবি ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০14 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের ১৮৪ জন কর্মী বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। i¨vwcW অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (i¨ve) এইসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। i¨ve সম্প্রতি হত্যা ও টাকার বিনিময়ে মানুষ গুম (কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জে যা হল) করার মত ঘটনার কারণে কুখ্যাতি অর্জন করে। উইকিলিকস এর ফাস করা তথ্য মতে i¨ve হল ব্রিটিশ সরকারের ইন্ধনে আয়োজিত একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম। i¨v¥eর বিচার বহির্ভূত হত্যা কাণ্ডের ঘটনাগুলোর জন্য আমেরিকাতে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এই ডেথস্কোয়াড থেকে সম্প্রতি আমেরিকান সরকার দূরত্ব বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের সময় i¨ve যে শত শত মুসলিমদের (যদি হাজার না হয়ে থাকে) হত্যা করেছে তার তুলনায় অবশ্য উপরের বিবরণ কিছুই নয়। গত বছরের ডিসেম্বরে খুলনায় ঘটে যাওয়া গণহত্যার সাথেও i¨ve জড়িত যেখানে তারা কয়েক ডজন নিরপরাধ মানুষকে রাতের আঁধারে হত্যা করে।
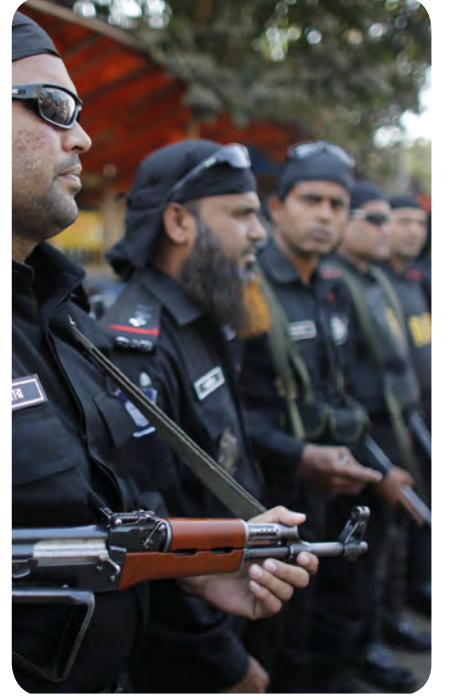
বাংলাদেশে আওয়ামী সরকার সেকুলারিজমের আসল রূপ প্রদর্শন করেছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যেন সেকুলারিজমের অন্ধ ভক্ত আওয়ামী লিগের জন্য যথেষ্ট নয়, বর্তমান সরকার ইসলামী চিন্তা-চেতনার লোকদের সাথে বিবাদে জড়ানোর জন্য একটি বানোয়াট বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। 'আন্তর্জাতিক বিচার ট্রাইব্যুনাল' বিচার বহির্ভূত হত্যার জন্য আওয়ামী লিগের 'বৈধ' হাতিয়ার। প্রহসনমূলক এই ট্রাইব্যুনাল ন্যূনতম ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা দেখাতেও ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত এক ডজনেরও বেশি রাজনৈতিক নেতাকে 'যুদ্ধাপরাধী' অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বাংলাদেশের কোন আদালতেই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এই সেই ট্রাইব্যুনাল যা আব্দুল কাদের মোল্লা, একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে ফাসিতে ঝুলানোর রায় দিয়েছে। পরস্পর বিরোধী অভিযোগের উপর ভিত্তি করে যা তৈরি হয়েছিল সরকার কর্তৃক 'বিনিময়' প্রাপ্ত একজন মাত্র 'সাক্ষীর' জবানবন্দীতে।

## বার্মা

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে অন্যতম হল বার্মার আরাকানের মুসলিমরা, যারা এখনও দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে দিন পার করছে। বাংলাদেশ সরকার ও থাইল্যান্ডের মুসলিম বিদ্বেষী সরকার বার্মার সীমান্ত পেরিয়ে আসা মুসলিম উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে বার্মা বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীর এক বন্দী-শিবিরে পরিণত হয়েছে। একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হলঃ এই বছরের শুরুতে বাংলাদেশ বর্ডারের নিকটবর্তী আরাকানের মংডু পৌরসভার দু চি ইয়ার তান গ্রামে বৌদ্ধ রাখাইন গ্রামবাসীরা ৮ জন মুসলিমকে হত্যা করেছিল যারা ঐ এলাকা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে যখন মুসলিমরা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে অপহরণ ও হত্যা করে, তখন পুলিশের লোকজন

স্থানীয় বৌদ্ধদের সাথে একজোট হয়ে আশপাশের গ্রামগুলোতে ৫০ জনের ও বেশি মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। তখন সরকার পুলিশকে সাধারণ অনুমতিপত্র দিয়েছিল ১০ বছরের বেশি বয়সী সকল মুসলিম পুরুষদের গ্রেফতার করার। এরপর কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে মুসলিমদের উপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ অব্যাহত ছিল। বার্মিজ সরকার নতুন আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করছে যেন কোন বৌদ্ধ মুসলিম হতে না পারে, মুসলিম পরিবার যেন নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি সন্তান নিতে না পারে এবং বহুবিবাহ যেন আইনত নিষিদ্ধ হয় (ইতোমধ্যে মুসলিমদের উপর বিবাহ কর আরোপ করা আছে)। জাতীয় আদমশুমারিতে সরকার জাতিগত রোহিঙ্গাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে, এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে যে তারা যদি আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাহলে তাদের "বাংলাদেশী অভিবাসী" হিসেবে থাকতে হবে।

আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কমিউনিটিগুলো 'কাশ্মীর'কে একটি বিতর্কের ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে। যখন তাদের ভারতের অনুমোদন প্রয়োজন পড়ে, তখন কাশ্মীরকে তারা সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দেখে। একবার যদি তাদের ভারতে অর্থনৈতিক শোষণ বা ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হয় তখন তারা কাশ্মীরের বিষয়টিকে পরবর্তীতে বিবেচনা করার জন্য ফেলে রাখবে। শক্তিধর দেশগুলোর জন্য কাশ্মীর একটি তুরুপের তাসে পরিণত হয়েছে।

শেখ শওকত, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে দেখে মনে হয় তারা বার্মার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন, নতুন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন এবং সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া- এসব রোম্যান্টিক কাহিনীতে মন্ত্রমুগ্ধের মতন ডুবে আছে, যখন অন্যদিকে সেখানে নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে।"

ব্র্যাড অ্যাডামস, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এশিয়া ডিরেক্টর

কাদিয়ানীদের সাথে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষাকে আমরা অনৈসলামিক বলে অভিহিত করি, কারণ শরীয়াহর একটা মূলনীতি হল ইসলামের একটি নীতিও যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে তা কুফর। তাদের সংবিধানে এমন আরও অনেক কিছুই আছে যা সরাসরি ইসলাম বিরোধী। এর বুনিয়াদ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ইসলামে গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই।"

মাওলানা আবদুল আজিজ গাজী, ইমাম, লাল মসজিদ, ইসলামাবাদ

# ৪ ধরণের অন্তর

*"সেই ভাগ্যবান যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে..."*

হুদাইফা বিন আল-ইয়ামান থেকে বর্ণিত, স্বার্থসমূহ/সাহচর্যতা অন্তরকে ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করে, "অন্তর ৪ প্রকারেরঃ যে অন্তর কেবল আলোকিত মশালে উদ্ভাসিত, তা মুমিনের অন্তর, বদ্ধ অন্তর হল অবিশ্বাসীর অন্তর, বিপরীতমুখী অন্তর হল মুনাফিকের অন্তর- সে শুধু প্রত্যাখ্যান করতে জানে, আর সে শুধু অন্ধের মতই দেখে; আর আরেক প্রকারের অন্তর যাতে ২ ধরণের প্রবৃত্তি কাজ করেঃ এক ধরণের প্রবৃত্তিকে বলে বিশ্বাস, এবং আরেক ধরণের প্রবৃত্তিকে বলে কপটতা - এটি এমন একটি প্রবৃত্তি যা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্যণীয়"[১]

'অন্তর যা কেবল...' উনার এ কথার অর্থ হল যে অন্তর আল্লাহ ও তার রাসূল ব্যতীত সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে। অতএব এটি নিজেকে সবকিছু থেকে পৃথকীকরণ ও নিরাপদ করে সত্য কে রক্ষা করে।

'আলোকিত মশালে উদ্ভাসিত', উনার এই কথার মর্মার্থ হল বিশ্বাসের উপযুক্ত স্থান। সুতরাং 'তা কেবলই' এই শব্দের মাধ্যমে তিনি মিথ্যা ধারণা এবং জাগতিক আকাঙ্ক্ষার ফলে ভুল দিক নির্দেশনা থেকে নিরাপদ অর্থে ইঙ্গিত করেছেন।
'আবদ্ধ অন্তর' বলতে অবিশ্বাসীর অন্তর বুঝায় কারণ এটি আবরণে মোড়ানো ও আবৃত, তাই জ্ঞানের আলো ও বিশ্বাস এতে পৌছাতে পারে না । খ্রিস্টান দের সম্পর্কে আল্লাহ তাই বলেন,

**"তারা বলে, (হেদায়েতের জন্য) আমাদের মন (ও তার দরজা) বন্ধ হয়ে আছে ......" [আল-বাকারা ২:৮৮]**

সত্যকে অস্বীকার করা ও একে গ্রহণ না করার ব্যাপারে দম্ভ দেখানোর ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তর মোড়কে আবৃত করে দিয়েছেন। ফলে এটি অন্তরে আবরণ, কানে মোহর এবং চোখের জন্য অন্ধত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখের জন্য এটি একটি অস্পষ্ট দৃশ্য বলে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

**"(হে নবী) যখন তুমি কোরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে আমি একটি প্রছন্ন পর্দা এঁটে দেই। আমি তাদের অন্তরের ওপর (এক ধরণের) আবরণ রেখে দেই, ওদের কানে (এনে) দেই বধিরতা।"** [বনী ইসরাঈল (১৭): ৪৫-৪৬]

এই ধরণের অন্তরের মানুষদের যখন তাদের তাওহীদকে পবিত্র করতে সতর্ক করা হয় এবং ইত্তিবা অনুসরণ করতে বলা হয় তখন তারা ঘুরে দৌড় দেয় !

'বিপরীতমুখী অন্তর' বলতে মুনাফিকের অন্তরকে বুঝায়, মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

**"এ কি হলো তোমাদের! তোমরা মোনাফেকদের ব্যাপারে দুদল হয়ে গেলে? (বিশেষ করে) যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছেন।"** [আন-নিসা, ৮:৮৮]

এর অর্থ হল তিনি তাদেরকে তাদের অন্যায় কাজকর্মের কারণে (তাদের অন্তরকে) পালটিয়ে দিয়েছেন এবং প্রতারণায় আছন্ন করে রেখেছেন।

অন্তরসমূহের মধ্যে এটি অত্যন্ত খারাপ এবং জঘন্য, এরা মিথ্যাকে সত্য মনে করে এবং যারা (মিথ্যাকে) অনুসরণ করে তাদের প্রতি স্নেহ ও সাহায্য প্রদর্শন করে থাকে। এরা সত্যকে মিথ্যা মনে করে এবং যারা (সত্যকে) অনুসরণ করে তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

"অন্তর যাতে দুই ধরণের তাড়না রয়েছে" বলতে সে অন্তরকে বুঝায় যা বিশ্বাস দ্বারা সুরক্ষিত নয় কারণ এটি সত্য যা আল্লাহ আল্লাহর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন তার প্রতি নিজেকে পুরোপুরি অনুগত করেনি। মূলত এতে কিছু বিশ্বাস এবং কিছু এর বিপরীত উপাদান রয়েছেঃ ইহা কিছু সময় বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের নিকটবর্তী; আর অন্যান্য সময় অবিশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাসের দিকে নিকটবর্তী। অন্তর তাই অনুসরণ করে যখন যেদিকে প্রভাবিত থাকে।
(ইমাম ইবন আল- কায়্যিম আল জৌজিয়্যাহ(র) দ্বারা রচিত *ইগহাতুল- লাহফান ফি মাসাঈদ আশ শায়তান থেকে নেয়া)*

১ ইবন আবি সায়বাহ হতে বর্ণিত , আল-ইমান [পৃষ্ঠা-১৭] এবং সহীহ ইসনাদ সহ অন্যান্যদের হতে বর্ণিত

# কাতারগুলো সুসংহত করার দিকে এক ধাপ

হাসান ইউসুফ

কায়েদা আল জিহাদ- জিহাদের ঘাঁটি, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে নিয়োজিত একটি দল হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। সময়ের পরিক্রমায়, এটি একটি সংগঠন থেকে রূপান্তরিত হয়ে একটি ডাক, একটি বার্তা, একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে যা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে, বর্তমানে জিহাদের এই মুল ঘাঁটি শুধু আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ নয়, এক দশকের মধ্যেই জিহাদের এই পবিত্র ডাক পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামের শত্রুরা বোকার মত ভাবতে পারে যে তারা 'খুবই কম সংখ্যক' প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়াই করছে এবং মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান তাদের ভৃত্যদের সৈন্যবাহিনী এবং তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম' দ্বারা এদের পরাজিত করা সম্ভব; কিন্তু ধ্রুব সত্য এই যে, জিহাদের এই ডাক শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) বা অন্য কারও নতুন কোন আবিষ্কার নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ডাক, আর যেই প্রভু এই ডাক দিয়েছেন তাকে পার্থিব অস্ত্রশস্ত্র বা শয়তানের সেনাবাহিনী ও তার মিত্রদের দ্বারা পরাজিত করা সম্ভব নয়।

গত এক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বেশ কিছু নেতার শাহাদাত প্রকৃতপক্ষে এই জিহাদের চালিকা শক্তিই বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং প্রাচ্যের আরও কিছু অঞ্চলের মুজাহিদরা আমেরিকা ও এর মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের এই ডাককে আলিঙ্গন করেছে। আল কায়েদা এভাবে এক উদ্দীপক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে; বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি দল ও ব্যক্তিদের শক্তিমত্তাকে সুসংহত করেছে এক সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য; বর্তমান যুগের ফেরাউন আমেরিকাকে পরাজিত করা এবং ফলস্বরূপ মুসলিম ভূখণ্ডগুলো পশ্চিমের ও এর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের থাবা হতে মুক্ত করে খিলাফতের ছায়ায় একটি ঐক্যবদ্ধ দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যা শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, উপমহাদেশের মুসলিমদের, বিশেষত মুজাহিদদের শ্রমগুলোকে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে জামায়াহ কায়েদা আল জিহাদের শাখা প্রতিষ্ঠা একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছেঃ

- আমেরিকা ও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত কুফরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।
- মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে শরীয়াহ বাস্তবায়ন ও ইসলামিক জীবনবিধান পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে কঠোর সংগ্রাম করা।
- দখলকৃত মুসলিম ভূখণ্ডগুলো শত্রুমুক্ত করা এবং কাশ্মীর থেকে আরাকান পর্যন্ত সকল নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমদের উদ্ধার করা।

• খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবুওয়্যাতের পদ্ধতিতে জিহাদ করা।

• আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতের প্রতিরক্ষা, যা বর্তমান জমানার খিলাফতের অগ্রদূত ও উম্মাহর মধ্যে খিলাফত পুনর্জীবিতকরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ।

• একটি ন্যায়পরায়ণ ইসলামী সমাজ গঠন করা যেখানে কারও উপর জুলুম করা হবে না, এমনকি কাফেরদের উপরও নয়।

এ কথা সত্যি যে ব্রিটিশ ও তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কৃত্রিম সীমানা তৈরি করে আপাতদৃষ্টিতে এই উপমহাদেশের মুসলিমদের বিভক্ত করে রেখেছে, কিন্তু বিশ্বাস আর সোনালী অতীতের যে বন্ধন তাদের মাঝে বিদ্যমান, ভূ-রাজনৈতিক স্রোতের পরিবর্তন, 'জাতীয়তাবাদ' ও 'জাতীয় রাষ্ট্র' নামক আমদানিকৃত ধারণা-এসব কোন কিছুর পক্ষেই সে বন্ধন ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এই অঞ্চলের মুসলিমদের নিয়ত, ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য, মুসলিম সমাজে ইসলামী ঐক্যের পুনর্জাগরণ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে জিহাদকে বাস্তবসম্মত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধুমাত্র দাওয়াহ ও নবুওয়্যাতের পন্থায় জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার মাধ্যমেই এই অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী উত্তরাধিকারের গতিপথ চূড়ান্তভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব। গনতন্ত্র ও অন্যান্য মানব রচিত পদ্ধতিগুলো হয়ত ক্ষণিকের জন্য পার্থিব সমৃদ্ধির বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে, কিন্তু তা কিছুতেই না পারবে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে, না পারবে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য সম্মানজনক ও সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে।

এই সংগঠন মূলত বহু বছর ধরে এই অঞ্চলে জিহাদরত দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ারই ফলাফল হিসেবে গঠিত। এই দলগুলোর নেতারা তাদের আমীর, শায়খ আয়মান আল জাওয়াহিরি (হাঃ) এর নির্দেশিকায় তাদের সৈন্যবাহিনীদের সমবেত করেছে মূলত একটি একক দল হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে; জামায়াহ কায়েদা আল জিহাদ, উপমহাদেশ শাখা। জামায়াহ কায়েদা আল জিহাদের এই নতুন শাখার নেতৃত্বে আছেন নামকরা আলেম, মাওলানা আসিম ওমর (হাঃ)। অন্যান্যদের মধ্যে শায়খ মুস্তাফা আবু ইয়াজিদ, শায়খ জামাল ইব্রাহীম আল মাসরাতি, শায়খ আবু ইয়াহিয়া আল লিবি, কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরি, কমান্ডার বদর মানসুর, ডঃ আরশাদ ওয়াহিদ, উস্তাদ হাসান গুল এবং উস্তাদ উমার আকদাস, (আল্লাহ্‌ তাদের রহম করুন) এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যারা এই সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। আশা করা হচ্ছে উপমহাদেশে জামায়াহ কায়েদা আল জিহাদ এই অঞ্চলে মহান আল্লাহ্‌ তাআলার শরীয়াহকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুজাহিদদের শ্রমগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবে যা মুসলিম উম্মাহর প্রায় এক তৃতীয়াংশের আবাসস্থল। আমরা বিশ্বাস করি যে জিহাদের পুনর্জাগরণই হল কাশ্মীর ও আরাকানের নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত আশা এবং এই অঞ্চলের মুসলিমদের উপর চলমান গণহত্যা বন্ধ করার একমাত্র মাধ্যম, হোক সেটা ভারতের গুজরাট, আহমেদাবাদ, মুজাফফরনগর, সাহারানপুর এবং আসামে অথবা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের হাতে অথবা পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে সেখানকার আর্মি ও সরকারের হাতে।

আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয় ও লেজ গুটিয়ে পালানো এই সংগঠন তৈরির পেছনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। আল কায়েদাকে দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র শত্রুদের জেনে রাখা উচিৎ যে আল কায়েদা একই সাথে একটি সংগঠন এবং একটি বার্তা, আর আজকে এই বার্তা এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যেটা তারা কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। এই জিহাদ শুধু আমেরিকার আফগানিস্তান থেকে পলায়নের সাথে শেষ হবে না; আমেরিকার পরাজয় তো শুধুমাত্র ভূমিকা। এই অঞ্চলে আমেরিকার মিত্রদের (পড়ুন পা চাটা চামচাদের) জন্য আরও কি অপেক্ষা করছে তা শুধু প্রকাশিত হতে বাকি।

আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের শুরুর দিকে আমাদের আমীর উল মু'মিনিন, আমাদের নেতা, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (রঃ) বলেছিলেন, *"বুশ ওয়াদা করেছিল যে আমাদের পরাজিত করবে, যখন আল্লাহ্‌ওয়াদা করেছেন যে তিনি আমাদের বিজয় দান করবেন। আমরা শীঘ্রই জানব কার ওয়াদা সঠিক ছিল"*। এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা যেমন সঠিক ছিল, তেমনি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে আমাদের প্রিয় মহানবী (সঃ) এর ওয়াদাও সঠিক হবেঃ *"আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ্‌ জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করেছেন; সেই দল যারা আল হিন্দ (ভারতীয় উপমহাদেশ) আক্রমণ করবে, এবং সেই দল যারা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর সাথে থাকবে"*।

"আমি যখন থেকে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সংস্পর্শে থাকতে শুরু করি, তখন আমি অনুধাবন করি আমি জীবিতদের মধ্যে একজন। কারণ আমি মনে করি আমার জীবন হলো ৮ বছর ও ছয় মাস; ৭ বছর হলো আফগান জিহাদে, আর ১ বছর ও ৬ মাস হলো ফিলিস্তিনের জিহাদে।
জিহাদ ব্যতীত একজন মানুষ মৃত, লজ্জিত, পরাভূত কাপুরুষ... তাদের ও মৃতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।"

**শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম**
(আল্লাহ তার উপর রহম করুন)

# খুরাসানের জিহাদে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন

উস্তাদ আহমদ ফারুক (রহিমাহুল্লাহ)

বাস্তবতা হল, এই জিহাদ সম্পূর্ণরূপে একটি চলমান অলৌকিক নিশানা। একদিকে, পঁয়তাল্লিশটি রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভূমি, সমুদ্র এবং আকাশ পথে আধিপত্য বিস্তার করছে। অপরদিকে মুজাহিদিনদের একটি ছোট্ট দল, যারা তাঁদের ঈমান নিয়ে শূন্য হাতে এদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দৃশ্যটি হল, স্পষ্ট ভারসাম্যহীন এই যুদ্ধ দশ বৎসর যাবত যে চলছে তা না বরং এই যুদ্ধে আপাত দুর্বল দলটিই স্পষ্টত বিজয় লাভ করছে। এরপরেও কী সর্বশক্তিমান আল্লাহর ঐশ্বরিক ক্ষমতা বুঝার জন্য অদৃশ্য থেকে কোন নিদর্শন আসার প্রয়োজন রয়েছে? এবং মুজাহিদিনদের ন্যায়পরায়ণতা উপলব্ধি করার জন্য আরো অনেক কারণ খোজার প্রয়োজন রয়েছে?

তবে জিহাদের এই অলৌকিকতা আল্লাহর একটি দয়া, আল্লাহ সময় সময় আরো অনেক কারামাত দৃশ্যমান করেন, যাতে মুমিনদের ঈমানী জযবা আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এটি হল একটি অকাট্য প্রমাণ যা মুনাফিক এবং কাফিরদের ব্যাপারে সন্দেহের দরজা বন্ধ করে দেয়। কয়েকজন সম্মানিত ভাইয়ের নিয়মিত জীদের ফলে আল্লাহর সাহায্য ও দয়ার উপর ভরসা করে আমি এই সিরিজটি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া মুজাহিদ এবং শহীদদের সাথে ঘটে যাওয়া কারামতের ঘটনাসমূহ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। এই লেখার প্রথম উদ্দেশ্য আমার নিজের ঈমানকে নবায়ন এবং শক্তিশালী করা। অধিকন্তু, আল্লাহর কাছে দুয়া করি তিনি যেন এই ঘটনাগুলোকে পাঠকদের ঈমান-বর্ধক হিসেবে কবুল করেন এবং জিহাদকে ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য লড়াই করার ইচ্ছা তাঁদের মধ্যে সঞ্চারন করেন।

জিহাদের সত্যতা, ফযিলত, প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য কুরআনের স্পষ্ট আয়াতগুলোই আসল প্রমাণ এবং হাদীস যা জিহাদ এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা ও এর মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। আর এইসব প্রশ্নাতীত উৎস হতে এগুলো উপলব্ধি করার পর আমরা আল্লাহর দয়ায় এই পথকে নিজের আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করি। অতঃপর এই পথকে গ্রহণ করার পর, এইসব খোশখবর, কারামত সমূহ এবং ঐশ্বরিক সাহায্যের নিদর্শনসমূহ এই ভীষণ কঠিন কিন্তু মহিমান্বিত পথে অটল থাকার শক্তির উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঐসব কঠিন পরীক্ষার সময়, যখন এক দিকে সমগ্র কুফফার বিশ্ব আফগানিস্তানে হামলার জন্য একজোট হয়েছিল এবং অন্যদিকে নিজের দেশের সেনাবাহিনী ও এজেন্সী গুলো মুজাহিদিনদের জীবনকে কঠিন করে তুলেছিল, তখন এই নিদর্শনগুলো ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মুজাহিদ বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণা। আজ কুফফাররা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। তারা রক্ত-স্খলন এবং ধ্বংসের জন্য মরনাস্ত্রসমূহকে অবিশ্বাস্য কার্যকরভাবে উন্নতি সাধন করেছে। তবে যায়োনিস্ট-ক্রুসেডার বাহিনীর সম্মুখে মুজাহিদিনদের অভিজ্ঞতা হল যে, এইসব কৃত্রিম মহাশক্তি অন্য কিছু বাস্তবতাকে প্রকাশ করে দেয়। আর তা হল এই বৃহত্তম সত্য যা প্রকাশ করে যতটুকু বস্তুগত শক্তিই মানুষ একত্র করুক, যতটুকু বস্তুগত উন্নতি সে সাধন করুক, তা কোন ব্যাপারই না, কেননা সে আল্লাহর একজন সৃষ্টি ব্যতীত কিছুই না। এবং সৃষ্টিকর্তার শক্তি, বিশালত্ব, প্রতাপ, গরিমা এবং অসীম আধিপত্যের সামনে ঐসকল শক্তি মশার ডানার চেয়ে বেশী কিছু নয়। আল্লাহর এইসব বিধান এবং তাঁর অপরিবর্তনীয় মূলনীতি সমানভাবে এই যুগেও প্রযোজ্য যেমনভাবে সেইদিনগুলোতে ছিল যখন তাঁদের হাতে ছিল তরবারি, বর্শা এবং তাঁর ঐশ্বরিক সাহায্য মুমিনদেরকে এই পথের প্রত্যেকটি পদে অটল রাখে। তবে শর্ত হল তাঁরা যেন আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করে এবং তাঁরা যেন সর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্যের আবেদন করে ও তাঁদের কাজ দ্বারা সমর্থন করে। □

শায়খ মানসুর আশ-শামী রহঃ এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২০০5 সালে খুরাসানের ভূমিতে, যিনি একজন মুজাহিদ আলিম এবং তানযিম কায়েদাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় শরয়ী বিভাগের সদস্য। তখন আমি একটি কোর্সের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তিনি সেই কোর্সে এসে একটি দিন ব্যয় করেছিলেন।

আমার মূল বক্তব্যে আসার পূর্বে, ঐ সভায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা উল্লেখ করা আমি পছন্দ করছি যা আমার মধ্যে গভীর ছাপ ফেলেছে এবং আল কায়েদার দাওয়াত সম্পর্কে আমাকে অধিক মাত্রার নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং এর নেতৃত্বে দ্বীনের যে কত গভীর বুঝ রয়েছে সে বিষয়ে অবগত করেছে। উক্ত সভায়, আল কায়েদার সামরিক প্রধান, শায়খ খালিদ হাবিব সহগামী হিসেবে শায়খ মানসুর আল-শামীর রহঃ সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আসর সালাতের পর, শায়খ মানসুর উপদেশ মূলক ভাষণ দিলেন এবং ভাইদেরকে তাঁদের কাজ ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য উৎসাহিত করলেন। এরপর একটি অনানুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হল। আলোচনার এক পর্যায়ে, তাকফীর সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তখন শায়খ খালিদ হাবিব মন্তব্য করলেন, “দুটি শব্দ যেগুলো আমাকে অতিশয় রাগান্বিত করেঃ তাকফীর ও তালাক।” এটি শুনে, শায়খ মানসুর আল-শামী তাঁকে বাধা দিলেন এবং বললেনঃ “যা আপনি বলেছেন তা সঠিক নয়। উভয় শব্দের পরিভাষাই আমরা শারিয়া দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। যদি এগুলোকে ব্যবহার করা হয় সঠিক স্থানে এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে, তাহলে এগুলোর জন্য বিরক্তি প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কাজেই, আপনার উচিত হবে না (শরিয়ার) এরকম সাধারণ পরিভাষার উপর অরুচি প্রকাশ করা।” আল্লাহ যেন শায়খ খালিদ হাবিবকে তাঁর দয়া বর্ষণ করেন! আমি এটি দেখেছি, তিনি নিরবে, বশীভূত হয়ে শায়খ এর কথা শুনছিলেন এবং মাথা নিচু করে রেখেছিলেন। তাঁর চেহারায় বিরক্তি/অতুষ্টির কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, যদিও তিনি ছিলেন শায়খ মানসুরের উপরের স্তরেরঃ সামরিক নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা এবং জিহাদের ময়দানে সময় ব্যয় করার দিক দিয়ে। দ্বীনি ইলম এবং আলিমদের প্রতি এমন অগাধ সম্মান একজন কেন্দ্রীয় সামরিক নেতার হতে এবং একজন আলিমের সামনে এমন নিরহঙ্কারতা প্রকাশ ছিল এমন একটি নিগূঢ় এবং কার্যকর শিক্ষা যা কোন মোটাতাজা বই পড়ে কক্ষনো উপলব্ধি করা যাবে না। অপরদিকে, শায়খ মানসুর আল-শামীর ইলমী চরিত্র এবং তাঁর অকুতোভয়তা আল্লাহ প্রদত্ত সীমানাকে রক্ষা করেছিল যা অনুকরণের জন্য আদর্শ।

শায়খ মানসুর আল-শামী রহঃ পরিচিত ছিলেন ইলমী গভীরতা, মধ্যপন্থা, আল্লাহ ভীরুতা, ইবাদাত এবং পরিশ্রমী হিসেবে। কয়েকটি বছরের জন্য, তিনি বিভিন্ন জিহাদী দলসমূহের দ্বীনি প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থেকেছিলেন। তিনি তূর্কীর ভাইদের পরিচর্যায় অনেক চেষ্টা সাধনা করেছিলেন। তিনি তাঁদের ইলম এবং ‘আমালকে পরিশোধিত করেছিলেন, যদ্বারা তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন “শায়খুল আতরাক”(তূর্কীদের শায়খ) হিসেবে। এর পাশাপাশি, তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মও চালিয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গাযওয়া থেকে কার্যকর শিক্ষা সম্বন্ধীয় চমৎকার একটি বই তিনি রচনা করেছিলেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

একটি লম্বা এবং ঘটনাবহুল জিহাদী সফর শেষে, সময়টি চলে এসেছিল যখন তাঁর বহুল আকাঙ্ক্ষিত শাহাদাহ পূর্ণ হয়েছিল। শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নের তাবিরটি ছিল এরকম যে তাঁর শাহাদাহ নিকটে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর পরিবারকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র বন্ধুদের মধ্যে বিলি করে দিলেন এবং অবশিষ্টাংশ বিক্রি করে দিলেন। তিনি তাঁর বাড়ি খালি করে ফেললেন, মাটিতে একটি চাটাই বিছিয়ে তাতে শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর, আমেরিকান একটি ড্রোন একটি মিসাইল ফায়ার করল যা তাঁর দেহকে টুকরো করে ফেলল। এইভাবে তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত শাহাদাহ পূর্ণ হল। আল্লাহ যেন এই প্রশান্ত আত্মাটিকে গ্রহণ করে নেন, তাঁর মর্যাদা উচ্চ করেন এবং মুজাহিদদের একজন হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেন, একজন শহীদ এবং আলিম হিসেবে বিচারের দিনে উত্থিত করেন, আমীন। ■

# রক্তের সুগন্ধ শুঁকে পাওয়া গেল হাসান গুলকে

অক্টোবর ২০১২, মীর আলী। মদীনার সিন্ধী বংশোদ্ভূত এক মুজাহিদ শাহাদাতের মাধ্যমে এক দীর্ঘ কিন্তু ঘটনাবহুল জিহাদী জীবন সমাপ্ত করলেন। বহু বছর ধরে হাসান গুল ইউএসের মাথা ব্যাথার কারণ ছিল। তরুন বয়সেই তিনি উসামা বিন লাদেনের দেহরক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং পরবর্তীতে শায়খ ইবনুশ শায়খ আললিবী (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) এবং শায়খ আবু যুবায়দা (আল্লাহ তাকে মুক্ত করুন) এর সঙ্গে থেকে মূল্যবান সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হয়, প্রথমে পাকিস্তানে, পরে ইরাকের কুর্দিস্তান থেকে তাকে আটক করে 'গুয়ান্তানামো বে'তে বন্দী করে রাখা হয়। 'গুয়ান্তানামো বে' থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পাকিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহন করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন সামরিক ভূমিকা রাখেন। হে আল্লাহ! আপনি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তার শাহাদাত, বন্দীত্ব এবং জিহাদকে কবুল করে নিন। আমিন! ]

আমি যখন জিহাদে অংশ নেই, তখন এই যুবক 'গুয়ান্তানামো বে'তে বন্দী হয়ে আছে। জর্জ বুশ তাকে ধরতে পেরে জনসমক্ষে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে নি। একজন সাচ্চা ঈমানদারের ন্যায় জিহাদের ডাকে ছুটে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই অধম বান্দাকে লম্বা সময় যাবত হাসান গুল নামের এই মুজাহিদ যুবার সঙ্গ লাভ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এমনকি কখনোও তো আমি আর সে একই গৃহে অবস্থান করেছি। এভাবে তার সাথে আমার পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে খুরাসানের ভূমিতে শত্রুদের হামলার মুখ থেকে বেশ কয়েকবার রক্ষা করেছিলেন।

যখন আল কায়েদার মিলিটারী প্রধান শায়খ খালিদ হাবীবকে শহীদ করে দেয়া হয়, তখন হাসান গুল তার সাথেই ছিলেন। শায়খ খালিদ (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন গাড়ির ভেতর আর সে ছিল বাইরে। সে কেবল হাত বাড়িয়েছিল গাড়ির দরজা খোলবার জন্য, ঠিক এমন সময় একটি মার্কিন ড্রোন থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা গাড়িটিকে আঘাত করে। এই হামলায় শায়খ খালিদ হাবীব শহীদ হয়ে গেলেও আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতের মাধ্যমে হাসান গুলকে রক্ষা করেন। এতে তার স্কিন বোন ফ্র্যাকচার হয়ে যায়।

এই হামলার কিছুদিন পর যখন আমি হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম, সে আমাকে একটা পয়সা তার জামার পকেট থেকে বের করে দেখাল, যেটা ড্রোন হামলার সময় তার বুক পকেটে ছিল। ড্রোন থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরনের সময় একটি ছোট শার্পনেল সেটি থেকে বের হয়ে পয়সাতে বিদ্ধ হয়।

আল্লাহর কুদরতে শার্পনেলটি তাঁর বুক ভেদ করে হৃদপিন্ডতে না ঢুকে এই সিলভারের কয়েনে আটকে যায়। এভাবে আল্লাহ তা'আলার গায়েবী সাহায্যের মাধ্যমে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ যাকে জীবিত রাখতে চান, কেউ তাকে মারতে পারে না।

আরেকবার, তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হয়। তাঁর পাশে বসে থাকা ভাইকে শহীদ করে দেয়া হয়, অপর একজনকে মারাত্মক জখমী করে ফেলা হয়। আর তিনি নিজেও পিঠে দুইবার গুলিবিদ্ধ হন। কিন্তু, সুবহানাল্লাহ! তিনি বেঁচে যায়। আমি যখন তাঁকে দেখতে গেলাম, তিনি ছিলেন চেতনা আর চেতনাহীনতার মাঝামাঝি। শুয়ে শুয়ে অবচেতন মনে তিনি বিড়বিড় করছিলেন, "আল্লাহ! তুমি কেন আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করছনা? কমান্ডার খালিদকে শাহাদাত দিলে, আমাকে কেন দিলে না? মেহসুদের মারকাযে সমস্ত সাথীকে শাহাদাত দিলে, আমাকে বাচিয়ে রাখলে। আল্লাহ...! তুমি কি আমায় শহীদ হিসেবে কবুল করবে না?" তিনি এই একই কথা বারবার বলছিলেন।

আল্লাহ তার বান্দার দু'আকে ফিরিয়ে দেন নি। গত বছরের অক্টোবরে তিনি যখন তাঁর মোটর বাইকে করে ঘর থেকে বের হন, তাঁকে টার্গেট করে মার্কিন এক ড্রোন থেকে মিসাইল ছোড়া হয়। যা সরাসরি তাঁকে আঘাত করে। তাঁর সমস্ত শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যখন তাঁকে খোঁজার জন্য কিছু মুজাহিদ সাথী ড্রোন হামলার স্থানে পৌছায়, তাঁর লাশ নিয়ে তারা মুশকিলে পড়ে যায়। কিন্তু, আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তাদের কাজ একেবারে সহজ হয়ে যায়। তাঁর শরীরের একটা বড় অংশ যখন তারা উদ্ধার করে, এক অপার্থিব মিষ্টি সুগন্ধে তারা বিমোহিত হয়ে যায়। যেই সুগন্ধ অন্য কোথাও থেকে নয়, বরং এই শহীদ মুজাহিদের বিচ্ছিন অঙ্গ থেকে আসছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রতিটি মুজাহিদ সাথী সেই সুগন্ধীর ঘ্রাণ শুঁকতে পারে। অবিকল একই সুগন্ধ লাশের অন্যান্য অংশ থেকেও নির্গত হচ্ছিল। মুজাহিদ সাথীরা সেই সুগন্ধ শুঁকে শুঁকে হাসান গুলের মৃতদেহের সমস্ত অঙ্গ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়। আয় আল্লাহ! আপনি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং জান্নাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে স্থান দান করুন। আমিন!
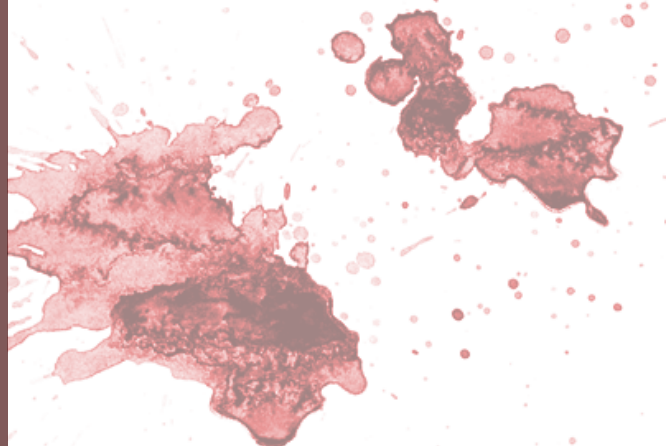
# এক আফগান শায়খের মর্মস্পর্শী ঘটনা: অ্যারেস্ট হয়ে গোপন টর্চার সেলে

একজন আফগান মুজাহিদ যিনি একইসাথে একজন আলেমে দীন ও দা'ঈ, জেল থেকে মুক্তহয়ে আমাকে এই বিস্ময়কর ও মর্মস্পর্শী ঘটনাটি শুনিয়েছেন। শায়খকে ২০০৯ সালে দক্ষিণ ওয়াযিরিস্তানের ওয়ানা নামক শহরের একটি হাইওয়ে থেকে বন্দী করা হয়।

ঘটনাটি এরকম। শায়খ তাঁর গাড়িতে করে এক বন্ধুর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। চলতে চলতে তিনি হঠাৎ করে হাইওয়ের বিপরীত দিকে পাকিস্তানি আর্মির কনভয় বা নিরাপত্তা-বহর দেখতে পেলেন। তিনি রাস্তা থেকে কিছু দূরে গাড়ি থামিয়ে কনভয়টি চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু, পাকিস্তানি আর্মি তার গাড়ি দেখে সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ে এবং গাড়িটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

আমার এই সম্মানিত ভাই বলেন, "কিছু সেনা আমার গাড়ির দিকে পায়ে হেটে এগিয়ে এলো এবং আমাকে গাড়ি থেকে বেরুতে বলল। আমি আমার সিটের পাশে রাখা কালাশনিকোভটাকে শক্ত মুঠে ধরলাম এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম গাড়ি থেকে নামবও না, আত্মসমর্পণও করব না। কিন্তু তারা আমাকে বিভিন্ন কথা বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে তাদের নেতার সাথে দেখা করার জন্য ফুসলাতে লাগল। তাদের ছলচাতুরীমূলক কথার ফাঁদে আমি পা দিলাম এবং গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এলাম। কিন্তু তাদের কাছে কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ করব না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

আমি যখন গাড়ি থেকে বের হয়ে তাদের কনভয়টা ভালমতো দেখার চেষ্টা করছিলাম,

**আমি যখন গাড়ি থেকে বের হয়ে তাদের কনভয়টা ভালমতো দেখার চেষ্টা করছিলাম, তখন... হঠাৎ করেই আমার দৃষ্টি একজন দীর্ঘদেহী এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুদর্শনা নারীর চেহারায় আটকে গেল। তার চেহারা এতই আকর্ষণীয় ছিল যে আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমি তার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে খেয়াল করে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। এমন পোশাক আমি আমার সারা জীবনে না কোন ওয়াযিরিস্তানি নারীকে পড়তে দেখেছি আর না অন্য কোন জাতির নারীকে। বরঞ্চ আমার মনে হয়, এমন পোশাক পৃথিবীর কোন নারী কোনদিন পড়েও নি এমনকি দেখেও নি।**

তখন... হঠাৎ করেই আমার দৃষ্টি একজন দীর্ঘদেহী এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুদর্শনা নারীর চেহারায় আটকে গেল। তার চেহারা এতই আকর্ষণীয় ছিল যে আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমি তার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে খেয়াল করে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। এমন পোশাক আমি আমার সারা জীবনে না কোন ওয়াযিরিস্তানি নারীকে পড়তে দেখেছি আর না অন্য কোন জাতির নারীকে। বরঞ্চ আমার মনে হয়, এমন পোশাক পৃথিবীর কোন নারী কোনদিন পড়েও নি এমনকি দেখেও নি। সে নারীর চেহারা ও শরীর থেকে এক প্রকার জ্যোতি বের হচ্ছিল, যা দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। এমন সময় আমাকে একজন সেনা খুব জোর দিয়ে বলল, তারা আমাকে অ্যারেস্ট করতে চায় না। সুতরাং আমি যেন আমার অস্ত্র গাড়িতে রেখে তাদের অফিসারের সাথে দেখা করে আসি। এক দিকে, এই সৈন্যদের চাপাচাপি করছিল আরেকদিকে সেই অপরূপা সুন্দরী নারী হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকছিল। আমি মনে মনে বুঝে ফেললাম, আমি যদি দৃঢ়পদ থেকে লড়াই করি, তবে শহীদ হয়ে যাব। আর এই নারী হচ্ছে জান্নাতের এক হুর, যাকে আমাকে দৃঢ় রাখতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু, আর্মির লোকদের বারবার আশ্বাস দেয়ার কারণে আমি ভাবলাম লড়াই ছাড়াই যদি বেঁচে যেতে পারি, তবে লড়াই করার কী দরকার? তাই আমি গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে ক্লাশিনকোভটা রেখে আসলাম। আমি যখন ফিরে এলাম, ঐ নারীকে আর দেখলাম না। সে চলে গিয়েছে। আমি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। এও বুঝলাম, আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

আসলেই তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। প্রতারক সৈন্যরা কথা রাখেনি। শায়খ কনভয়ের কাছে যাওয়ার সাথে সাথেই তাকে বন্দী করা হয়। এরপর তাঁকে কিছুদিন ওয়ানা ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। সেখান থেকে তাঁকে পেশাওয়ারে ISI (পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা) এর একটি গোপন কারাগারে বদলি করা হয়। সেখানে তাঁর উপর জঘন্যতম অত্যাচার চালানো হয়। কখনও তাঁকে জোর করে উলঙ্গ করা হত। কখনও তাঁকে দড়িতে বেঁধে উপুড় করে ঝুলিয়ে রেখে পানিতে চুবানো হত, যাতে তাঁর দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর উপক্রম হত। আর প্রায়ই তাঁকে স্টীলের মোটা রড দিয়ে পেটানো হত। তাঁর দাড়ি নিয়ে তামাশা করা হত। সংক্ষেপে, সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের বিভীষিকাময় অত্যাচার তাঁর উপর করা হয়, শুধুমাত্র একজন দীনের আলেম হওয়ার অপরাধে।

আর এই অগ্নিপরীক্ষার সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত তখন উপস্থিত হয় যখন তাঁকে অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি বদ্ধ অন্ধকার সেলারে হাত বেঁধে ফেলে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে হল তাঁর সারা শরীরে কী যেন ভরে যাচ্ছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন রুমের ফ্লোরে কয়েক হাজার তেলাপোকা কিলবিল করছে। আর শ'খানেক তেলাপোকা তাঁর গা বেয়ে উঠছে। আরও বীভৎস বিষয় হচ্ছে বিড়ালের মত বড় বড় কয়েকটা ক্ষুধার্ত ইঁদুর তাঁর শরীরে কামড়ানো শুরু করেছে। ব্যথায় আর ভয়ে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তিনি ব্যথায় আর্তনাদ করছিলেন, কিন্তু জেলখানার কেউই তাঁর দিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না। তিনি বুঝলেন, এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সাহায্যকারী নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর যিকির করা শুরু করে দিলেন। তিনি খেয়াল করলেন, এখন আর কোন ব্যথা লাগছে না। তাঁর শরীর যেন অনুভূতিহীন হয়ে গেছে, যদিও তখনও ইঁদুর এবং তেলাপোকা তাঁর শরীর কামড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু, যখনই তিনি যিকির থামিয়ে ফেলতেন, তীব্র ব্যথায় তিনি ককিয়ে উঠতেন। তিনি নিশ্চিত হলেন, আল্লাহর স্মরণই তাঁকে আশ্রয় দিতে পারে।

এর চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় এই ভাই আমাকে বলেছেন, সেলারে যখনই তিনি সালাত আদায় করতেন এবং সাজদাহর জন্য মাটিতে ঝুঁকতেন, সারি সারি তেলাপোকা আর ইঁদুর সরে গিয়ে তাঁর কপাল রাখার জন্য জায়গা করে দিত! আর যখন তিনি মাটি থেকে কপাল তুলতেন তেলাপোকা আর ইঁদুর দিয়ে আবার কপাল রাখার সেই জায়গা ভরে যেত। ছোট্টছোট্ট জীবের একজন দুর্বল মুজাহিদের প্রতি এই আচরণ দেখে তাঁর ঈমান আরও শক্তিশালী হয়। তিনি আরও দৃঢ়তার সাথে বুঝতে পারেন, মুজাহিদগণ সত্যের উপর আছে এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর সমস্ত মাখলুকের করুণা আমাদের সাথে আছে। ■

# আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারী নারীদের জন্য সুসংবাদ

"ঐ সমস্ত নারীরা কোথায়, যারা ওয়াযিরিস্তানে হিজরত করেছিল? তারা সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে!"

শায়খ ইয়াকুব (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) যিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তম প্রকৃতির, রক্ষণশীল ও প্রফুল্ল মেজাজের একজন ভাই। তিনি সর্বদা নিজেকে ইবাদতে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি বিস্ফোরক ও ইলেক্ট্রনিক্সে পারদর্শি ছিলেন।

তিনি একদিন আমাদেরকে তার দেখা একটি বিস্ময়কর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন- "আমি দেখলাম বিচার দিবসে সকল মানুষ একত্রিত হয়েছে। মুজাহিদগণ ও অন্য কিছু মুসলমান এক স্থানে একত্রিত হয়েছে। আমরা একটি শব্দ শুনতে পেলাম আমাদেরকে বলছে, 'জান্নাতে প্রবেশ করুন।' আমরা সকলেই তাড়াহুড়ো করে জান্নাতের দিকে ছুটলাম। প্রত্যেকেই অন্যের আগে প্রবেশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বাধা দেওয়া হলো। আমাদের অদূরেই একটি ক্যাম্পে মুসলিম নারীরা বসা ছিল। আমরা একটি কণ্ঠে বলতে শুনলাম "ঐ সমস্ত নারীরা কোথায়, যারা ওয়াযিরিস্তানে হিজরত করেছিল? তারা সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে!" ■

# সারাদিন যুদ্ধ মাত্র ৬ - বুলেটে!

আমি যখন প্রথম জিহাদের জন্য খুরাসানে আসি, তখন এক মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে আমার বেশ হৃদ্যতা ও আন্তরিক বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এই প্রিয় মুজাহিদ ভাই আমার কাছে একটি বড় অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন!

তিনি বলেন, "সময়টা ছিল ২০১২ সালের গ্রীষ্মের এক ভোর...। মিরানশাহের (পাক-আফগান সীমান্তবর্তী একটি শহর) এক বাড়িতে কয়েকজন মুজাহিদ নেতা গোপন বৈঠকে বসেছেন, এই খবর পেয়ে পাকিস্তানী আর্মি সেই বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। অতঃপর শুরু হয় গুলি বিনিময়। বাড়িটির কাছেই আমি সহ চার-পাঁচ মুজাহিদ ভাই অবস্থান করছিলাম। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে, আমরা দ্রুত সেখানে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে গিয়ে দেখলাম- আর্মির কয়েকটি পিকআপ ও ট্রাক সেই বাড়িটিকে চারপাশে বেষ্টন করে আছে, সৈন্যরা নিরপরাধ স্থানীয় লোকদের ধরে ধরে বেধড়ক পেটাচ্ছে এবং একটি ট্রাকের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহতল্লাশী চাল্লাচ্ছে। যদিও আর্মি সেনারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক গুন বেশী ছিল, কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার উপর ভরসা করে আর্মিদের গাড়ি লক্ষ্য করে অস্ত্র চালাতে শুরু করি। ভোরসকালে আমরা যুদ্ধ শুরু করেছিলাম, যা আসর পর্যন্ত অবিরত চলতে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় আর্মিরা এই চার-পাঁচ জন মুজাহিদের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে, শেষমেশ ওয়্যারলেস কিংবা ফোনে মিরানশাহ ক্যাম্পে যোগাযোগ করে, এবং সেখান থেকে সাহায্যের জন্য হেলিকপ্টার ও রিজার্ভ করা সৈন্যদের পাঠাতে বলে। আমরা যেই স্থানে ছিলাম তার আশেপাশের পাহাড়গুলোতে কয়েকটা আর্মি পোস্ট ছিল। তারা আমাদের উপর গোলা বর্ষণ করা শুরু করে। এতদসত্ত্বেও, আল্লাহর সাহায্য মুজাহিদদের সাথে ছিল। যার ফলে সামান্য এই চার-পাঁচজন ভাইয়ের হাতে আর্মি সেনারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি বরন করে। দুই পক্ষের গুলি বিনিময়ে প্রায় ৩০ জন আর্মি সেনা নিহত হয়। বিকাল গড়িয়ে রাত এসে পড়লে, আর্মির সৈন্যরা পালিয়ে নিকটবর্তী একটি আর্মি পোস্টে চলে যায়, আর পেছনে রেখে যায় বেশ কয়েকটা গাড়ি, অনেক অস্ত্র-সশত্র এবং তাদের এক কর্নেলের মৃতদেহ।"

আমাদেরকে এই ঘটনা যিনি শোনাচ্ছেন অর্থাৎ উস্তাদ আহমদ ফারুক (রহিমাহুল্লাহ) তিনি বলেন, আমার প্রিয় এই মুজাহিদ ভাই সারাদিন ব্যাপী এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন। আল্লাহ তাঁর এই আমলকে কবুল করুন! এই ভাই আমাকে বলেছেন, "আসরের দিকে আমার খেয়াল হল যে আমি আমার M-16 রাইফেলের সাথে মাত্র দুই ম্যাগাজিন গুলি নিয়ে এসেছিলাম। আর একটি ম্যাগাজিনে মোট ৩০টি বুলেট থাকে। সারাদিন ধরে রাইফেল চালিয়ে বিকেলের দিকে আমি যখন ম্যাগাজিন খুললাম, দেখলাম তখনও তাতে চার-পাঁচটা বুলেট বাকি আছে!" আমার এই ভাই এখনও আশ্চর্য হয়ে বলেন, ভোর সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা গুলি চালানোর পরও আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর গুলি ফুরিয়ে যায় নি! নিঃসন্দেহে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মুজাহিদ বান্দার প্রতি একটি সরাসরি সাহায্য ছিল যে, মাত্র ২ ম্যাগাজিন গুলি দিয়ে তিনি সারা দিন যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন! ■

আমরা উম্মাহর ঠিকাদারও নই অথবা উম্মাহর উপর নিজেদের কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। বরং আমরা উম্মাহরই একটি অংশ। প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরকে উম্মাহর সেবক মনে করি। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে উম্মাহকে হেফাজত করি। আমাদের রক্ত দিয়ে উম্মাহর সম্মান রক্ষা করি। এবং আমাদের আত্মা বিসর্জন দিয়ে তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও সাহায্যেই। একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ মহান মুজাহিদদের হাতে। একমাত্র তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ঐকান্তিক ইচ্ছা, উদারতা ও আত্মবিসর্জনের মাধ্যমেই এটা প্রতিষ্ঠিত হবে।

শায়খ আয়মন আল জাওয়াহিরী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)

২০,০০০ এরও অধিক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে...
শতাধিক মসজিদ পুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে...
১৮০,০০০ লোক গৃহহারা হয়েছে...

বার্মায়
গণতন্ত্রে... প্রত্যাবর্তন

ইমামের সাথে কাটানো দিনগুলি
শায়খ আয়মান আয যাওয়াহিরি

**নিচের অংশটি শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর সাথে, শায়খ আয়মান আয যাওয়াহিরি (হাঃ) এর কাটানো সময়গুলোর স্মৃতিচারণের কিছু উদ্ধৃতাংশ। এই লেখাটি মূলত শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর সেই ব্যক্তিগত গুণাবলীসমূহের প্রতি আলোকপাত করে যা বহির্বিশ্ব থেকে লুকানো ছিল।**

শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর চরিত্রে একটি সুনির্দিষ্ট অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। যারা কোনদিন তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়নি, তারা তার ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে অজ্ঞ, যা হল তার স্নেহপূর্ণ হৃদয়। মানুষজন আল্লাহ্‌র এই সিংহকে গর্জন করে বলতে শুনে ছিলেন, "আমেরিকা এবং আমেরিকাবাসীরা কখনই শান্তির স্বপ্নও দেখতে পারবে না যতদিন না আমরা ফিলিস্তিনে শান্তি দেখতে পাই", অথবা বুশকে হুমকি দিতে দেখে অভ্যস্ত ছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই হয়ত জানে না যে শায়খ ছিলেন খুবই নরম হৃদয়ের, ধৈর্যশীল ও অনুভূতিপ্রবণ। শায়খ অসাধারণ বিনয় এবং উন্নত আচরণের অধিকারী ছিলেন, যা সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। যে কেউই তার সাথে বসে কথা বলার সুযোগ পেত, সে তার ভাল আচরণ, সুন্দর ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের প্রশংসা না করে পারত না।

একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি তার মাধ্যমে বিষয়টি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব, আমি নিজেও সে ঘটনার একটা অংশ ছিলাম। তোরাবোরাতে যখন এক ভাই আমার পরিবারের শাহাদাত বরণের সংবাদ নিয়ে আমার কাছে আসছিল, শায়খ তাকে সংবাদটি আমাকে জানাতে মানা করলেন। যখন আমরা ফজরের স্বলাত আদায়ের জন্য উঠলাম, শায়খ আমাকে ইমামতি করতে বললেন। স্বলাত শেষে আমরা সকালের জিকিরে ব্যস্ত ছিলাম, জিকির শেষে আমি দেখলাম ভাইরা একে একে রুম ছেড়ে চলে যাওয়া শুরু করেছে, শেষ পর্যন্ত আমি একাই রুমে ছিলাম। তখন যে ভাই সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তিনি রুমে প্রবেশ করলেন। তিনি সান্ত্বনা দেওয়া শুরু করলেন এবং ধৈর্যশীল হতে উৎসাহ দিলেন। এরপর তিনি আমাকে আমার স্ত্রীর, আমার পুত্রসন্তানদের এবং সবশেষে আমার কন্যার শাহাদাত বরণের খবর দিলেন। সবশেষে তিনি আমাকে আরও তিনজন ভাইয়ের কথা জানালেন যারা তাদের নিজ নিজ পরিবারের সাথে শাহাদাত বরণ করেছেন।

এই সংবাদ শোনার পর আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লাম, এবং আল্লাহ্‌র কাছে ধৈর্য ও এই কষ্টের প্রতিদান প্রার্থনা করলাম। সেই মুহূর্তে শায়খ রুমে প্রবেশ করলেন এবং আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল। তিনি আমায় সান্ত্বনা দিলেন এবং অন্যান্য ভাইরাও একে একে আসা শুরু করলেন। তারা সবাই আমায় সান্ত্বনা দিলেন, যা আমার শান্ত হতে সাহায্য করল এবং আমায় সাহস যোগাল। সবাই সম্মত হয়েছিল যে পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা ঐ দিন অন্য স্থানে সরে পড়ব। আমরা সংখ্যায় ৩০ জনের মত ছিলাম। শায়খ ভাইদেরকে তাদের যাত্রা শুরু করার নির্দেশনা দিলেন, এবং আমায় বললেন যে তিনি আরও কিছু ভাইসহ আমার সাথে থাকবেন। আমি উপদেশ দিলাম যে আমরা যাত্রা শুরু করি, কারণ চলাফেরা ও ভ্রমণ একজন মানুষকে তার দুঃখ ভুলতে সাহায্য করে। কিন্তু শায়খ জোর করলেন যেন আমরা থাকি।

ফলে আমরা সেদিন সেখানেই অবস্থান করলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছিলাম। পরের দিন আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। আমি আল্লাহ্‌র

অধিকাংশ মানুষই হয়ত জানে না যে শায়খ ছিলেন খুবই নরম হৃদয়ের, ধৈর্যশীল ও অনুভূতিপ্রবণ।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম

শায়খ উসামা

শায়খ আবু হাফস

কাছে প্রার্থনা করলাম যেন তিনি আমাদের পরিবারগুলোকে এবং যারা গত হয়েছে তাদের কবুল করে নেন এবং আমাদের পুরষ্কার হতে বঞ্চিত না করেন। পরবর্তীতে আমি যখন প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠলাম, আমি মাঝে মধ্যে শায়খের সামনে আমার পুত্র মুহাম্মাদ এর নাম নিতাম, শুধু তার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়া অশ্রু দেখার জন্য।

আরেকটি ঘটনা আছে যা আমি সব সময়ই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। যখন আমার মায়ের মৃত্যু হল, তখন শায়খ উসামা (রহঃ) ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি আমায় একটি সুন্দর চিঠির মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যা আমায় সহনশীল হতে সাহায্য করেছিল। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম এবং তাকে বললাম যে, আমি খুবই অবাক হয়েছি যে আমার মায়ের মৃত্যুর খবর কিভাবে আমার আগে তার কাছে পৌঁছাল। আল্লাহ্‌ তাকে পুরস্কৃত করুন।

যে কেউ শায়খের সাথে সময় কাটিয়েছে সে খুব ভালভাবেই জানে যে তিনি কতটা নরম হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তার চোখে প্রায়ই অশ্রু মুক্তার মত ঝলমল করত। কথাবার্তা চলাকালীন সময় মাঝে মাঝে তার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। সবাই জানত যে তিনি সহজেই কান্না করে দিতেন। তিনি একবার আমায় বললেন যে, "কিছু মানুষ বলে আমি নাকি কথা শুরু করার আগেই কান্না শুরু করে দিই, আমার একটু চেষ্টা করা উচিৎ এটা থামানোর।" এবং আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "এ বিষয়ে আমার কি করা উচিৎ?" আমি বললাম, "শায়খ, এটা হল দরদ, যা আপনার অন্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা ঢেলে দিয়েছেন। এটা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, বরং এটাকে আল্লাহ্‌র রহমত মনে করুন।"

এ বিষয়ে আমি আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, আমি যার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলাম। আমরা একবার কাবুলের কাছে আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'আইনাক' এ ছিলাম, পরে আরও কিছু ভাই এসে আমাদের সাথে যোগদান করলেন। ঐ সময়ে শায়খ শুধুমাত্র ফিলিস্তিন ও গাজা নিয়ে একটা বিবৃতির কথা তুললেন, যে বিবৃতিতে তিনি ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করার ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সম্ভবত এটা সেই বিবৃতি যেখানে ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের পুত্রদের রক্ত, আমাদের পুত্রদের রক্ত। আর তোমাদের রক্ত আমাদের রক্ত। এবং রক্তের বদলা রক্ত, ধ্বংসের বদলা ধ্বংস।" সেখানে উপস্থিত এক ভাই বললেন যে তিনি মিডিয়ায় ফিলিস্তিনি মহিলাদের প্ল্যাকার্ড হাতে ঘোষণা দিতে দেখেছেন, "হে উসামা, আমরা তোমার ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় রয়েছি।"

এ কথা শুনে শায়খ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তার চেহারায় ঐ কথাগুলোর প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এরপর আমরা ক্যাম্পের মসজিদে ইশার স্বলাতের জন্য গেলাম। আলো খুব ক্ষীণ ছিল। ফরয স্বলাতের পর শায়খ সুন্নাহ স্বলাত আদায়ের জন্য মসজিদের কোণায় গেলেন, ঐ সময় আমি স্পষ্ট তার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনলাম। আমি বুঝতে পারলাম এটা ফিলিস্তিনি মহিলাদের তার ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় থাকার সংবাদ শোনার কারণেই। আমি বিশ্বাস করি, তার কর্মের মাধ্যমে তিনি যথার্থই তার ওয়াদা পূরণ করেছেন।

শায়খের জীবনের একটি সুন্দর দিক ছিল তার সন্তানদের সাথে তার সম্পর্ক। তার সন্তানদের মধ্যে তিনি যে উঁচুমাপের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়েছিলেন, তা তার কাছের মানুষদের সকলেই লক্ষ্য করেছিলেন এবং এটা ছিল একটা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্‌ তাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের ও সমস্ত মুমিন বান্দাদের সন্তানদের অনুগত বানান। ধনকুবের ব্যক্তির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তারা অতিথিদের নিজ হাতেই আপ্যায়ন করতেন। অতিথিরা নিজে নিজে কোন কাজ করতে পারতেন না, এমনকি হাত ধোওয়া ও শুকানো থেকে শুরু করে সব কাজে তাদের সাহায্য করা হত। এক কথায়, তারা অতিথিদের এতটা সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন যা দেখে সবাই তাদের হিংসা করত।

আমি নিজেও এই কথাগুলো শুনেছি, "শায়খ তার সন্তানদের কত সুন্দরভাবে লালন পালন করেছেন!" অবিরাম যাত্রা, ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন এবং অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি- এত কিছু সত্ত্বেও শায়খ তার সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতেন। সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতেন আল্লাহ্‌র কালাম মুখস্ত করাকে।

> আমার বিশ্বাস, তার সন্তানদের অধিকাংশই কুরআনের একটা বড় অংশ অবশ্যই মুখস্ত করেছে, কেউ কেউ হয়ত পুরোটাও মুখস্ত করেছে। আল্লাহ্ ঈমানদারদের সন্তানদের এরূপ নেক আমল করার তওফিক দান করুন।

আমার বিশ্বাস, তার সন্তানদের অধিকাংশই কুরআনের একটা বড় অংশ অবশ্যই মুখস্ত করেছে, কেউ কেউ হয়ত পুরোটাও মুখস্ত করেছে। আল্লাহ্ ঈমানদারদের সন্তানদের এরূপ নেক আমল করার তওফিক দান করুন। যাই হোক, তার সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি একজন বিশেষ উস্তাদ নিযুক্ত করেছিলেন।

এখানে আমি এই ব্যক্তির সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি। তিনি কোন সাধারণ উস্তাদ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন শানকিত এর সবচেয়ে সম্মানিত আলিম, যার ছিল আরবি ভাষা, কুরআন তিলাওয়াত এবং ধর্মীয় গ্রন্থের মূল দলীল সংক্রান্ত বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা। আমি সহ আরও অনেক মুজাহিদ ভাই তার দ্বারা উপকৃত হয়েছিলাম। তিনি আমার সেই শিক্ষক ছিলেন যার সম্পর্কে আমি আমার কিতাব 'আল-তাবরি'আহ'তে কিছু আলোচনা করেছি। তিনি শুধু একজন শিক্ষকই ছিলেন না, বরং একাধারে একজন মুহাজির, মুজাহিদ এবং শায়খ উসামা (রহঃ) এর মত একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ারও ছিলেন।

'আরবদের গ্রামে' শায়খ একটি ঘোড়া রেখেছিলেন যা পরবর্তীতে শায়খ কিনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর আস্তাবলে রেখেছিলেন। 'আরবদের গ্রাম' হচ্ছে এমন আরেকটি গল্প যা আলাদাভাবে বর্ণনা না করলেই নয়। যদি আল্লাহ তৌফিক দান করেন তাহলে এই বরকতময় গ্রাম সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। এটা ছিল খুবই অদ্ভুত আর বরকতময় এক জায়গা যেমনটি আমি আমার গোটা জীবনে কোথাও দেখিনি। ওখানে কাটানো দিনগুলি কতই না চমৎকার ছিল...... এমন ভালো সময় আমি কখনই কাটাইনি।

যখনই আমরা শায়খের বাড়িতে তাঁর দারসে অংশ নিতাম, শায়খ আমাদের জন্য খাবারের পাশাপাশি অসাধারণ মৌরতানিয়ান চা বানিয়ে খাওয়াতেন। আমরা তাঁকে বাঁধা দিয়ে বলতাম, "আপনি আমাদের উস্তাদ, কেন আমাদের লজ্জায় ফেলছেন?" কিন্তু আমাদের কথায় তিনি পাত্তা দিতেন না এবং নিজেই আমাদের আপ্যায়ন করতেন। আমার মনে পড়ে, আমি যখন তাঁকে অনুরোধ করলাম আমাকে কুরআনের তাফসির ও আরবি ভাষা শিখাতে তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা আমাদের পাঠ প্রথমে আল্লাহর কিতাব শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার মাধ্যমে শুরু করব। কেননা মানুষের শিখানো জ্ঞানের আগে আল্লাহর কিতাবের হক আদায় করাটা জরুরি।" আমি আমার কিতাব 'আল-তাবরি'আহ'তে উল্লেখ করেছি যে, কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুনের উপর শায়খ মোটামুটি মাঝারি আকারের একটি ভুমিকা পেশ করলেন, এরপর আমরা 'আল-জাঝারি' পড়া শুরু করি।

মাশাআল্লাহ! শায়খ যেন ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র; তবুও তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি ছিল সাবলীল ও বোধগম্য। গ্রামের মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-নীতি পরিচিত ভঙ্গিমায় তাঁকে পড়াতে দেখতাম। যেমনঃ 'ইকফা' ও 'ইদ্গাম' এর মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে তিনি একটি বস্তুকে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন এবং বললেনঃ "দেখুন! এটা লুকানো হয়েছে। অথচ এটা অন্য আরেক বস্তু যার উজ্জ্বলতা কমে গেছে। তাই এটা

‘মুদ্গাম’হয়ে গেল”। এই বিষয়ে তিনি লোকদেরকে সবকিছু খুব সহজে বুঝাতেন। যখন আমরা আল-জাঝঝারিতে দারসে অংশ দিতাম, মাঝে মাঝে আমাদের সাথে শায়খ আবু উবাইদা আল মৌরতানিয়ান এবং শায়খ আবু হাফসও অংশ নিত।

বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শায়খ মাঝে মাঝে আমাদের ফল কিনে দিতেন। আমি তাঁকে বলতাম, “শায়খ! এটা আমাদের দায়িত্ব”। উত্তরে তিনি বলতেন, “এটা তোমার জন্য নয়, বরং তোমার ছেলে মুহাম্মদের জন্য”। তেমনিভাবে একবার তিনি আমাদের জন্য মাছ নিয়ে আসলেন। আমি বললাম, “শায়খ! এটা আমাদের কর্তব্য। আপনি কেন করলেন? ”তিনি আবারও বললেন, “এটা তোমার জন্য নয়, তোমার ছেলে মুহাম্মদের জন্য”। উনিই হচ্ছেন সেই উস্তাদ যিনি শায়খ উসামার বাচ্চাদের পড়াতেন এবং আমি যার ছাত্র হতে পেরে গর্বিত।

শায়খের বাচ্চাদের পড়ানোর সময় তিনি খুব কঠিন নিয়ম মেনে চলতেন। আমার মনে আছে শায়খের বাচ্চাদের বকা দিতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন, “বেটা! ভালভাবে বললে তো মনে হয় তোমরা বুঝবে না। তোমাদের বাবার সাথে আজকে থেকে বুঝে-শুনে কথা বলবে। নাহলে তোমাদের বেতের ভাষা বুঝতে হবে!” শায়খের সব বাচ্চা একসাথে জড়সড় হয়ে বসল এবং তাদেরকে ভীত দেখালো। শায়খ উসামা তাদেরকে আদবের যে শিক্ষা দিলেন, তারা কখনও উস্তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস করত না।

শায়খ উসামা বাচ্চাদের লালন-পালনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি মসজিদে ‘ইসলামে শিশুদের লালন-পালন’ এই শিরোনামে দারস দিতেন এবং ‘ইসলামে শিশুদের লালন-পালন’ নামক কিতাবের উপর হালাকার আয়োজন করতেন।

আমি জানি শায়খের সন্তানদের তাদের বাবার প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা এবং সহানুভূতি ছিল। আমি বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে দেখেছি তারা তাদের বাবাকে ঘিরে প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করে বাঁচাতে প্রস্তুত থাকত। তারা তাঁর সাথে ছায়ার মত লেগে থাকত এবং সবসময় তাঁর জন্য নিজেদের জান কোরবান করতে প্রস্তুত থাকত। শায়খের সন্তানদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বলতে গেলে আলাদাভাবে বলতে হবে, পরে কখনও আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব। এই মুহূর্তে আমার মাথায় স্মৃতির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে!

শায়খ এবং তাঁর সন্তানদের নিয়ে হৃদয় কুঠারে আঘাত করার মত দুটি ঘটনা না বলে পারছি না। প্রথমটা হয়েছিল জালালাবাদে। যখন মুনাফিকরা জালালাবাদ দখল করে নিতে শুরু করল তখন আমরা পাহাড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা তখনও বুঝতে পারিনি ঘটনাগুলো এতো দ্রুত ঘটে যাবে এবং এতো তাড়াতাড়ি আমাদের কাবুল ছেড়ে দিতে হবে। তখন শায়খের সাথে তাঁর সন্তানদের যে কজন ছিল তাদের মধ্যে তিন জন ছিল খুব ছোট। এদের মধ্যে একজন ছিল খালিদ (রহঃ), যিনি পরবর্তীতে শায়খের সাথে শহীদ হয়ে যান। খালিদ

## যে কেউই তার সাথে বসে কথা বলার সুযোগ পেত, সে তার ভাল আচরণ, সুন্দর ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের প্রশংসা না করে পারত না।

ছিল ওই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আমরা শহরের বাইরে চলে আসি এবং ‘তোরাবোরা’ পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করি। সেদিন সন্ধ্যায় আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে একজন ভাই ওই তিন জন সন্তানকে নিয়ে আসেন যাতে তারা তাদের বাবাকে বিদায় জানাতে পারে।

শায়খ তাঁর সন্তানদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে ওই ভাইদের বিশ্বাস করতেন, যেখান থেকে তাঁর সন্তানরা পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবে। যখন বিদায় জানানোর সময় আসল তখন শায়খ তাদের পাশে বসালেন। এই আবেগঘন মুহূর্ত আমি দূরে দাড়িয়ে দেখতে লাগলাম। একজন বাবা তাঁর তিনটা ছোট বাচ্চাকে বিদায় জানাচ্ছে, তিনি জানেননা কখন বা কোথায় তাঁর সন্তানদের আবার দেখতে পাবেন। জানেননা এটাইকি প্রথম বিদায় নাকি শেষ! আমি দেখলাম শায়খ তাদের বিদায় জানাচ্ছেন এবং বলছেন তারা যেন তাদের আঙ্কেলদের সাথে যায় যারা তাদেরকে তাদের পরিবারের কাছে নিয়ে যাবে। বড় ছেলেটা অঝোরে কান্না করছিল এবং শায়খ নিজেও খুব আবেগী হয়ে গিয়েছিলেন। সবচেয়ে ছোটটা তো কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না, শায়খের কাছে অভিযোগ করছিল, “কিন্তু বাবা, আমি আমার নতুন ব্যাগ কাবুলে ফেলে এসেছি! এখন আমি সেটা কিভাবে ফেরত পাব?” অবুঝ শিশুটা জানেনা, ক্রুসেডাররা কাবুল দখল করে নিয়েছে। শায়খ বললেন, “চিন্তার কিছু নাইরে মানিক! তোমার আঙ্কেল তোমাকে নতুন ব্যাগ কিনে দিবে!” তারপর তারা চলে গেল। এটা ছিল খুবই হৃদয় বিদারক দৃশ্য; বাবা তাঁর ছেলেদের থেকে আর ছেলেরা তাদের বাবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তারা জানে না কখন আর কিভাবে তারা আবার মিলিত হবে।

ক্রুসেডারদের আক্রমণের সময় এরকম আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যা শায়খের প্রতি আমার অন্তরকে শ্রদ্ধায় পূর্ণ করে দেয়। এটা ছিল এমন এক সময়ে যখন আমরা ক্রমাগত আমাদের স্থান পরিবর্তন করছিলাম, আমাদের সাথে শায়খের একজন ছেলে ছিল। আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অসহায়, রাতে অন্ধকারে আমরা পথ চলছিলাম আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তাঁর সাহায্য নিয়ে। গাড়ি এমন একটি জায়গায় এসে থামল যখন শায়খ তাঁর গাইডের সাথে এক দিকে চলে যাবেন আর আমরা চলে যাব অন্য দিকে। এমন এক মুহূর্তে শায়খ গাড়ি থেকে নেমে আসলেন তাঁর ছেলেকে বিদায় জানাতে। একমাত্র আল্লাহই জানেন কখন আবার তারা পরস্পরকে দেখতে পাবে। একবার কল্পনা করে দেখুন শায়খ ওই মুহূর্তে তাঁর ছেলেকে কি বলেছিলেন! তিনি বললেন, “বেটা! চল আজ আমরা শপথ নেই যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে কখনও বিরত হব না”। এগুলো ছিল এমন কিছু মুহূর্ত যা আমি কখনও ভুলবো না। ▯

### শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)

“আল্লাহর কসম, আমেরিকান শত্রুদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে বিশ্বাসের মূল এবং তাওহীদের নির্যাস। দ্বীন (ইসলাম) নকল উপাস্য ধ্বংস করা ব্যতীত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই আল্লাহ্‌ব্যতীত; আমাদের অবশ্যই সকল নকল উপাস্যদের বর্জন করতে হবে। ‘যে তাগুত (নকল উপাস্য) বর্জন করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে এমন শক্ত হাতল ধরেছে যা কখনো ছুটে যাবে না’... সুতরাং, এই বাতিল উপাস্যে অবশ্যই অবিশ্বাস পোষণ করতে হবে।”

আমরা বিশ্বব্যাপী এমন এক ধারার মুখোমুখী যা আমাদের অনুকূল বা বন্ধুভাবাপন্ন নয়।
বরং এটা আমাদের সামনে কোন বিকল্প রাখেনি।

**আপনি হয় ম্যাকডোনাল্ডস, বেছে নিবেন অথবা ম্যাকডোনেলডগলাস***
**আপনার মাথার উপরে তাদের F-15s পাঠিয়ে দিবে!**

শায়খ আনোয়ার আল আওলাক্বি
(আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন)

McDonald's

Coca-Cola

* F-15s এর ডিজাইনার

নবীদের ভূমি

# আপনার অপেক্ষায়

শাইখ মুহাম্মদ বিন মাহমুদ বাহতীতী
(আবু দুজানা আল-পাশা)

সিরিয়ার জন্য মুসলিমদের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান রয়েছে, আর কেন-ই বা থাকবে না যখন স্বয়ং আল্লাহ এই ভূমিকে এমন সমস্ত গুনে গুণান্বিত করেছেন এবং এমন উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, যা অন্য কোন ভূমিকে করেননি। সিরিয়ার অতীত ইতিহাস এই ইলাহি ফয়সালার স্বাক্ষর বহন করে।

**ইসলামের ইতিহাসে সিরিয়া দীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদে অসাধারণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে। ক্রুসেডারদের আক্রমণের সময়, এমনকি পরবর্তীতে তাতারদের আক্রমণের সময়ও সিরিয়ার ভূমি অভেদ্য দুর্গ হিসেবে দণ্ডায়মান ছিল। আজকেও সিরিয়াতে যে অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে, কৌশলগত কারণে তা অসামান্য তাৎপর্য বহন করে। কারণ সিরিয়া ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের একেবারে পাশ ঘেঁষে অবস্থিত। যেই অবৈধ রাষ্ট্রটি সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আরবের দালাল শাসকদের সরাসরি মদদে টিকে আছে।**

আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও করবে। সিরিয়ার ফযীলত বর্ণনা করে ও সেখানে বসবাস করার উৎসাহ প্রদান করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিরিয়ার জন্য বিশেষ বরকতের দু'আ করেছেন। সিরিয়া এমন এক ভূমি যা হাজারো নবীর পদ স্পর্শে ধন্য হয়েছে। এটা সেই ভূমি যেখানে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি'রাজের রাত্রিতে সফর করেছিলেন। আর কিয়ামতের পূর্বে এখানেই মুমিনদের সেনাবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার অবস্থিত হবে। সমস্ত উম্মাহ যখন ফিতনায় আক্রান্ত থাকে, তখনও সিরিয়ার ভূমি ঈমানের সতেজতায় সজীব থাকে। কিয়ামতের পূর্বে এখানেই মুসলিমীন ও কুফফারদের ভয়াবহ কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আর সত্য ও মিথ্যার সর্বশেষ লড়াইয়ের ফয়সালাও এখানেই হবে। মহাযুদ্ধের (মালহামা) সময় সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের 'গুতা' শহরে মুসলিমরা অবস্থান নিবে। সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতেই ইমাম মাহদীর সেনাবাহিনী রোমানদের (ইউরোপিয়ান/পশ্চিমা বাহিনী) মোকাবেলা করার জন্য একত্রিত হবে, আর হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এই সিরিয়ারই দামেস্ক শহরের সাদা মিনারে আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এখানে মুসলিম বাহিনী দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং অবশেষে ঈসা আ. দাজ্জালকে হত্যা করবেন। কিয়ামতের পূর্বে এই সিরিয়া থেকেই মুসলমানদের রূহ কবয করা হবে। এমনকি হাদীসে এ-ও বর্ণিত হয়েছে, শেষ বিচারের দিন সিরিয়ার ভূমিতেই হাশরের ময়দান কায়েম হবে।

তবে সিরিয়ার সবচেয়ে বড় যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা হল- এই উম্মাহর বিজয়ী দল (ত্বাইফাতুল মানসুরাহ) কিয়ামত এসে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সিরিয়াতেই অবস্থান করবে। কোন বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা শত্রুর শত্রুতা যে দলের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইসলামের ইতিহাসে সিরিয়া দীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদে অসাধারণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে। ক্রুসেডারদের আক্রমণের সময়, এমনকি পরবর্তীতে তাতারদের আক্রমণের সময়ও সিরিয়ার ভূমি অভেদ্য দুর্গহিসেবে দণ্ডায়মান ছিল। আজকেও সিরিয়াতে যে অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে, কৌশলগত কারণে তা অসামান্য তাৎপর্য বহন করে। কারণ সিরিয়া ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের একেবারে পাশ ঘেঁষে অবস্থিত। যেই অবৈধ রাষ্ট্রটি সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আরবের দালাল শাসকদের সরাসরি মদদে টিকে আছে।

উম্মাহর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ানক রক্তপাত, বরং সমগ্র মানব ইতিহাসেরই সবচেয়ে বীভৎস রক্তপাতের পর আজকে সিরিয়াতে এমন একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে যার সুদূর প্রসারী প্রভাব সমস্ত চেনা-জানা পট পরিস্থিতিকে পাল্টে দিতে সক্ষম। আর এমনটা হওয়া আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল। বিশ্বের তাবৎ 'শক্তিধর'রা বহু আগেই সিরিয়ার নাজুক পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ফেলেছে। আর তাই, তারা আজ পাল্লা দিয়ে এই অঞ্চলে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একের পর এক কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা এই পুণ্যময় ভূমিকে ঘায়েল করে যাচ্ছে। ইসরাঈল ও ইরানের প্রতি হুমকি হয়ে যাওয়ার কারণে তারা সিরিয়ার যুদ্ধে বাগড়া দিয়েছে। তাই আমরা দেখছি আসাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে, আর যায়োনিস্ট রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করতে তারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে।

সিআইএ'র সাবেক ডিরেক্টর কিছুদিন আগেই বলেছে, আসাদকে টিকিয়ে রাখতে পারাটাই এই দ্বন্দ্বের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল। তার উক্তিতে,

"সম্ভাব্য ফলাফলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বলে ইতি টানতে হচ্ছে যে- আসাদের ক্ষমতায় টিকে থাকাটা মোটেও খারাপ কিছু নয়... পরিস্থিতি এতই জটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন যা কি-না মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর ধরে এই অঞ্চলে আমাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বলতে হচ্ছে, আসাদের সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার চাইতেও জঘন্য কিছু ঘটতে পারে।"

অন্য দিকে, সিরিয়া এখনো আমাদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছে যার প্রয়োজন এই যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই ছিল। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, গ্লোবাল জিহাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী চলমান ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে চাইলে সিরিয়ার জিহাদকে সমর্থন ও সহযোগীতা করা অতীব প্রয়োজন। আর এটাও আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, সিরিয়াতে চলমান দ্বন্দ্ব সত্যিকারের পরিস্থিতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরবে এবং শত্রুরা গোপনে গোপনে আমাদের বিরুদ্ধে কী জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে তা দিবালোকের মত পরিষ্কার করে দিবে।

প্রথমত, সিরিয়ার যুদ্ধ শিয়া রাফেযীদের প্রকৃত চেহারা উম্মাহর সামনে উন্মোচন করে ফেলেছে, এবং ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাদের সীমাহীন বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিয়েছে। উম্মাহকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ পর্যন্ত তারা যত ফাঁকা বুলি ছেড়েছে, সিরিয়ার যুদ্ধ তার সবগুলোর অসাড়তা প্রমাণ করে দিয়েছে, তাদের লুকিয়ে রাখা সমস্ত মুনাফিকী সবার সামনে ফাঁস করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সিরিয়ার দ্বন্দ্ব এ-ও প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতার বেলায় সমস্ত কুফফাররা একক জাতির ন্যায় জোটবদ্ধ। মুসলিমদের ব্যাপারে পূর্ব-পশ্চিমের সকল কাফির তাদের অবস্থান এতটুকুও বদলায়নি। ইরাক, সোমালিয়া, চেচনিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তান, মালিতে যারা মুসলিমদের জবাই করেছে, তারা সিরিয়ার মুসলিমদের সাথেও ঠিক একই আচরণ করছে। পৃথিবীর যেকোনো স্থানের মুসলিমদের সাথে তারা অভিন্ন আচরণই করবে। প্রকাশ থাকে- সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের সাথে তারা ভবিষ্যতে এই আচরণই করবে।

আজকে যখন আমরা সেই দাসত্বের শিকল ভেঙে মুক্ত হতে চাচ্ছি যা এই উম্মাহকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, আমরা আবিষ্কার করি- এই শৃঙ্খল মুক্তি সিরিয়াতে আমাদের বিরুদ্ধে করা সমস্ত চক্রান্তের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এত বড় ঐতিহাসিক ও পটপরিবর্তনকারী ইস্যুতেও উম্মাহ নির্বিকার। কিভাবে শত্রুর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্ভব, যখন সমস্ত উম্মাহর মধ্য কেবল ছোট্ট একটি অংশ এই ইস্যুতে বিচলিত হয়? সারা মুসলিম জাহান আসাদ বাহিনীর তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের হাতে একের পর এক অভূতপূর্ব নির্বিচার গণহত্যার সাক্ষী হয়েছে। সিরিয়াতে আমাদের ভাই-বোনেরা বড় আশা নিয়ে উম্মাহর দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরও মুসলিম উম্মাহ যে সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, সত্যিই সেটা তাদের ভাই ও বোনদের প্রতি সুবিচার হয় নি। পুরো বিশ্ব, আমি এই অঞ্চলে যাদের স্বার্থ নিহিত আছে তাদেরকে নিয়েই বলছি, আসাদের সরকারকে দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে। যেন সিরিয়ার মুসলিমরা রক্ত ঝরাতে ঝরাতে এক কষ্টদায়ক নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। কেন কোটি কোটি সদস্যের এই উম্মাহ এখনও সিরিয়ান যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে না? সিরিয়ার যুদ্ধের ফলাফল যে কতটা সুদূরপ্রসারী, কেন সেটা তারা এখনো বুঝতে পারছে না?

এই সবকিছু বলার পরেও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই উম্মাহর মাঝ থেকে কল্যাণ ও হিতকামনা কখনো শেষ হয়ে যাবে না, বরং চিরকাল বাকি থাকবে, এবং সিরিয়ার বরকতময় ভূমিও স্বীয় ফযীলতসহ স্থায়ীভাবে টিকে থাকবে। ইনশাআল্লাহ! মুজাহিদগণ আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই সিরিয়ার অত্যাচারিত মুসলিমদের রক্ষা করতে সফল হবেন, আল্লাহর দীনকে বিজয় এনে দিবেন, এবং পরিশেষে আল আকসাকে মুক্ত করে তবেই ক্ষান্ত হবেন।

আমরা দৃঢ় আশা রাখি, মুজাহিদগণ শরীয়াহর শাসনকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম

**আমরা জাবাহাত আন নুসরা এবং সাধারণ জিহাদি আন্দোলনের ভাইরা আমেরিকানদের এই পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম। কিছু মানুষ এই বক্তব্যে হতচকিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের যথেষ্ট লম্বা সময় থেকে মানুষদের বোকা বানিয়ে আসছিলো – আমেরিকা-ইরান বন্ধন এখন ওপেন সিক্রেট।**

**শায়খ আবু মুহাম্মদ ফাতেহ আল জাওলানি**
আল জাজিরা ইন্টারভিউ

**"আজকে আমরা সিরিয়াতে যে ধ্বংসলীলা দেখছি তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। যদিও এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি বিষয় যা প্রতিটি মুমিনকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে, এরকম পরিস্থিতি ছাড়া একটি জিহাদ সফলতার সাথে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা। ভূমিটি আফগানিস্তানের অবস্থানে পৌঁছে গেছে, যেখানে আমিরুল মুমিনীন মোল্লাহ মুহাম্মদ উমরের আমেরিকা বা পূর্ব-পশ্চীমের হুমকিকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যেখানে জীবনের অনেক দাম বিশেষভাবে যেখানে মানুষ জিহাদকে ভয় পায়, তাদের জন্য এটা তাদের বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দের ইতি টানে। তথাপি তারা দুনিয়াবি সম্পদ হারাবার ভয়ে সেচ্ছায় অপমান ও দাসত্ব মেনে নেয়। এর জন্য সম্মানিত ব্যক্তি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রতার ভয় করিনা"। এটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু সমগ্র জাতির বেলায় এটি আরও বেশি প্রযোজ্য। বিলাসিতা জিহাদের শত্রু এবং সত্য ও যারা একে তুলে ধরে তাদের শত্রু।"**

**শাইখ আবু কাতাদা**
**(আল্লাহ্ তাঁকে হেফাজত করুন)**

করে যাবেন, কুফরের আধিপত্যের অবসান ঘটাবেন, এবং শত্রুর সমস্ত চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সিরিয়ার মুজাহিদদের আমাদের নৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি আমাদের বস্তুগত সমর্থনেরও তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। সহজ ভাষায় বললে- আমরা বিশ্বাস করি উম্মাহর বর্তমান জ্বলন্ত পরিস্থিতিতে, প্রতিটি মুসলিমের কাঁধে অত্যন্ত ভারী দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু, যদি কেবল সিরিয়ার যুদ্ধের কথাই বিবেচনায় আনা হয়, যা এই যুগের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ ইস্যু। আমাদের দায়িত্বের ভার অত্যন্ত গুরুতর হয়ে যায়। এখানে আমি সিরিয়ান ইস্যুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরছি। যেগুলো সম্পন্ন করতে প্রত্যেক মুসলিমের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

- *সিরিয়া সহ সারা বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য দু'আ করা, এবং বিশেষ করে মুজাহিদদের জন্য দু'আ করা যারা এই দীনের খাতিরে লড়ে যাচ্ছে । এ ব্যাপারে কারো কোনও অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আল্লাহকে ডাকতে কারো কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।*
- *অর্থের মাধ্যমে সিরিয়ার জিহাদকে সাহায্য করা, কারণ অর্থব্যয়ই জিহাদের প্রাণশক্তি। আর এটি ছাড়া জিহাদ পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব নয়।*

- *সশরীরে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করা, যা ইসলামের জন্য ত্যাগের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত, এবং যা একজন মুমিনের ঈমান ও ঈমানের দাবীর প্রতি সত্যবাদিতার অগ্নিপরীক্ষা। আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার দ্বারাই আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করা, এবং জান্নাতে চিরকালের অনাবিল সুখ লাভ করা সম্ভব।*
- *কথার মাধ্যমে জিহাদে অংশ নেয়া, মুসলিমদেরকে স্বীয় দীনের হিফাযত করার লক্ষ্যে সিরিয়ার জিহাদে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সর্বাত্মকভাবে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা।*
- *মুজাহিদদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে, এবং তাদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা।*
- *কোন্দল রত দলগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।*

নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে যে- সে এই দীনের সাহায্যের জন্য কী সাহায্য করেছে, এবং সিরিয়া ও অন্যান্য জায়গার অত্যাচারিত মুসলিমদের সাহায্য করতে কী প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে। যারা এদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে দুনিয়াবি ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে আছে, কিংবা মুনাফিক শাসকদের বেতন ভুক্ত দরবারী আলেমদের কথা শুনে নির্বিকার হয়ে আছে, কিংবা আরামের ঘরে বসে থেকে নিজ আরাম আয়েশের জন্য জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরোধিতা করে যাচ্ছে তারা শেষ বিচারের দিন আল্লাহর কাছে কোন জবাব দিতে পারবে না। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে তাদের, যারা উম্মাহর এই ক্রান্তি লগ্নে জিহাদে অংশগ্রহণ না করে উম্মাহর প্রতি নৈতিক বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়ে চরম হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এতেও ক্ষান্ত না হয়ে উল্টো জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরোধিতায় সচেষ্ট হওয়ার মত জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ, এবং আল্লাহর কাছে জবাব দেয়ার আগে নিজের কাছেই জবাবদিহিতা করে নিজ নিজ অবস্থা ও পরিণতি যাচাই করা উচিৎ।

পরিশেষে, আমি আপনাদের প্রত্যেককে নবীদের ভূমির দিকে রওয়ানা হওয়ার জন্য আহ্বান করছি, সাথে সাথে উৎসাহও দিচ্ছি। যে ভূমির ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন-তিন বার বলেছেন, “সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ!” সাহাবীরা তখন জিজ্ঞেস করেছিল, “কেন? ইয়া রাসুলাল্লাহ!” আল্লাহর রাসুল উত্তর দিয়েছিলেন, “কারণ আল্লাহর ফেরেশতারা সিরিয়ার উপর নিজেদের ডানা বিছিয়ে রেখেছেন।” তারপর তিনি বলেছিলেন, ইয়েমেনে একটি বাহিনী থাকবে, সিরিয়াতে একটি বাহিনী থাকবে, আর ইরাকেও একটি বাহিনী থাকবে। কিন্তু সিরিয়ার বাহিনীতে যোগ দেয়াটাই রাসুলুল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ছিল। তিনি বলেছিলেন, “সিরিয়া আল্লাহর যমীনের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমি যেখানে আল্লাহ তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট বান্দাদেরকেই নিয়ে আসবেন!”

সুতরাং, আল্লাহর যমীনের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান! যেন আপনিও আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট বান্দাদের একজন হতে পারেন!

আল্লাহ তাঁর নবীর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া সাল্লাম।

**সিরিয়ার জনতা ও অত্যাচারিত মুসলিমদের জন্য দোআ করুন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, বিশেষভাবে মুজাহিদদের জন্য – যারা এই দ্বীনের জন্য লড়াই করে, এটি সিরিয়ার জন্য সকল মুসলিমদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব!**

“কত ছোট দল আল্লাহর হুকুমে
বড় দলকে
পরাজিত করেছে!”
(আল কুরআন)

# আপনি জানেন কি?

## ১০ টি e fû | পূর্ব তুর্কিস্থান সম্পর্কে

১/ ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব তুর্কিস্থান কখনোই চীনের অংশ ছিলোনা। হ্যানচাইনিজরা যেসকল অঞ্চলকে উপনিবেশে পরিণত করেছিলো তাদের মধ্যে পূর্ব তুর্কিস্থান একটি। এটি চীনের মহাপ্রাচীরের বাইরে অবস্থিত যাকে বানানো হয়েছিলো চীনকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে, ইউমেনপাস বা জাদে গেইটপাস এর পশ্চিমাংশকে চীনের পশ্চিম সীমানা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে অঞ্চলটিকে জিনজিয়াং/সিনকিয়াং (নতুন রাজ্য) নাম দিলেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা পরিবর্তন হয়ে যায় না।

২/ গত দুই সহস্রাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮০০ বছর পূর্ব তুর্কিস্থান চীনের পরাধীনতা থেকে মুক্ত ছিলো। শেষ ১০০০ বছরের ইসলামের ইতিহাসে ৭৬৩ বছর ধরে অঞ্চলটি স্বাধীন ছিলো। আর বিভিন্ন সময়ে মোট ২৩৭ বছর চীনের অধিন ছিলো।

৩/ ১৯৪৯ সালে পূর্ব তুর্কিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৩% উইঘুর (তুর্কি মুসলিম) আর বাকি ৭% ছিলো চাইনিজ। কিন্তু গত ছয় দশক ধরে চলে আসা জোরপূর্বক স্থানান্তর আর তাদের জায়গায় হ্যানচাইনিজদের বসবাস করতে দেয়ার রীতির ফলস্বরূপ আজ পূর্ব তুর্কিস্তানের ৪৫% মানুষ চাইনিজ।

৪/ ১৯৪৯ সালে কম্যুনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কম্যুনিস্ট সরকার বিভিন্ন সময়ে ধারাবাহিক নৃতাত্ত্বিক (মুসলিম) নির্মূল অভিজানের মাধ্যমে প্রায় ৪৫ লক্ষ্য তুর্কি মুসলিম হত্যা করে।

৫/ চাইনিজ সরকার কোর'আন ও অন্যান্য যত বই পেয়েছে বাজেয়াপ্ত করেছে। ৩০,৭০০ ছাপানো ধর্মীয় বই পুড়ানো হয়, ২৮,০০০ মসজিদ বন্ধ করে সেই জায়গায় মদের দোকান খোলা হয়, ১৮,০০০ মাদ্রাসাকে বানানো হয় গুদাম। ১,২০,০০০ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে (আলেম, মসজিদের ইমাম) হত্যা করা হয়, ৫৪,০০০ জনকে জোরপূর্বক শ্রমশিবিরে পাঠানো হয়।

৬/ চীনে কোর'আন শিক্ষা দেওয়ার শাস্তি ১০ বছর কারাদন্ড।

৭/ চীনে মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধান করা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। কাউকে হিজাব পরিহিত অবস্থায় পাওয়া গেলে ৫৬০০ ডলার (প্রায় ৪,৩৬,০০০ টাকা) জরিমানা। একজন সাধারন তুর্কি মুসলিমের বাৎসরিক গড় আয় ১০০০ ডলার (প্রায় ৭৮,০০০ টাকা)।

৮/ চীন পূর্ব তুর্কিস্তানে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি পারমানবিক টেস্ট করেছে। আর এ পর্যন্ত পূর্ব তুর্কিস্তানে প্রায় ২,০০,০০০ মানুষ তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে মারা গেছে। কেবল এক বছরের হিসাব মতে (১৯৯৮সাল) প্রায় ২০,০০০ বিকলাংগ শিশুর জন্ম হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে ক্যান্সার, অজানা রোগ আর পক্ষাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা স্পষ্টতই বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯/ ২০ বছরের নিচের তরুনদের জন্য কোরআন শিক্ষা করা, মসজিদে সালাত আদায় করা, জুমুয়ার সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। শুক্রবার জুমুয়ায় সালাতের সময়সীমা ২০ মিনিট।

১০/ চীন পূর্ব তুর্কিস্তানে ১০ লক্ষ সৈন্য ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রাখে।

“এই পৃথিবী ধ্বংস হোক;
শেষ হয়ে যাই আমরা সবাই;
আমাদের সকল গ্রুপ, প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা বিলুপ্ত হোক...
কিন্তু আমাদের হাতে যেন কখনো কোনো মুসলিমের একফোঁটা
রক্ত বিন্দুও না লাগে। এটাই সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত।”

শায়খ জামাল ইব্রাহিম আল মাসরাতি
(আত্তিয়াতুল্লাহ আল-লিবী)

' K ʒxʒ exp N j p pun V ō i (

## ফিলিস্তিন মুক্ত করার কার্যকর পদক্ষেপ এবং খিলাফাতের পুনরুদ্ধার

**আমাদের জন্য এটাই সময় সেয়ানে সেয়ানে লড়াই করার, এবং নিজস্ব অবরোধ গড়ে তোলার, এবং ইহুদী ও ক্রুসেডারদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার, এমন জায়গায় আঘাত করার মাধ্যমে যেখানে আঘাত করলে তারা আহত হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফিন্যান্স নামে পরিচিত তাদের অর্থনীতির হৃদপিণ্ড ও জীবনীশক্তিকে আঘাত করতে হবে।**

# তাদের অবরুদ্ধ কর!

■ আদম ইয়াহিয়া গাদান

দুই দশকের বেশি সময় ধরে মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের দখলদারিত্বের সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হল আরবদের জন্য ফিলিস্তিনের নিছক ক্ষুদ্র একটি অংশ যা হবে পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট একটি দুর্বল, অরক্ষিত ও নামমাত্র স্বাধীন অঙ্গরাজ্য আর ইহুদীদের হাতে থাকবে ফিলিস্তিনের সিংহ ভাগ যেখানে তারা নিজদের ইচ্ছামত শাসন ও দুর্নীতি চালিয়ে যেতে পারবে। তথাকথিত "দুই রাষ্ট্র সমাধান"- বাস্তবিকভাবে যাকে বলা যায় "এক ও আধা রাষ্ট্র সমাধান" (অথবা হয়ত "এক ও এক-তৃতীয়াংশ সমাধান"!) – শুধু ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অধিবাসীদের কাছে অগ্রহনযোগ্য নয়, এটি ইসলামী শারীয়াহ বিরোধী, এবং এই বিষয়কে উপেক্ষা করা হয় যে ফিলিস্তিন একটি মুসলিম রাষ্ট্র আর মুসলিম রাষ্ট্রই থাকবে; এই কারনেই শুধুমাত্র একটি পথ সামনে আছে এবং ফিলিস্তিন "প্রশ্নের" ন্যায়সঙ্গত উত্তর হল এর অখন্ডতা ও সব ধরনের পুনরুদ্ধার সহ ফিলিস্তিনের মুসলিমদের থেকে মুসলিমের দ্বারা এবং মুসলিমদের জন্য "ইসরাইল" রাষ্ট্র অপসারন। ফিলিস্তিন হল মুসলিমদের, কারন ফিলিস্তিন হল নবীদের ভুমি আর নবীদের সত্যিকার উত্তরাধিকারী হল মুসলিমরা, ইহুদীরা নয়।

যদি তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকে যে আল্লাহর অংগিকার জালিমদের জন্য নয়, যদিওবা তারা নবীদের বংশধর হয়, তাহলে ইহুদীদের এমন দাবির বৈধতা থাকে কিভাবে যে ফিলিস্তিন তাদের জন্মগত অধিকার? ইসরাইলের অধিবাসীরা যাদের মধ্য থেকে ইহুদীরা উদ্ভুত হয়েছে তারা যে কেবলমাত্র একক আল্লাহর ইবাদত করা, শুধুমাত্র আল্লাহর খাতিরে ভালো কাজ করা, ভালোকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ করা এবং তাঁর দ্বীন প্রচারের দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, তাদেরকে সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের জন্য যেসকল নবী ও রাসুল প্রেরণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে কোন কোন নবী ও রাসুলকেও তারা অবিশ্বাস করেছে, এর ব্যাপকতায় এদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা খুন করেছে এবং অন্যদেরকে ঈশ্বর বানিয়েছে। এরপর শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ ইসলামী রাষ্ট্র বাদ দিয়ে কিভাবে ইহুদীরা- নবীদের হত্যাকারী ও তাদের প্রচারিত ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিপথগামী- ন্যায়সংগতভাবে নবীর ভুমি অধিকারের দাবি করতে পারে? সহীহ মুসলিমের হাদিস অনুসারে, পৃথিবীর প্রথম মাসজিদ, মক্কার আল-মাসজিদ আল- হারাম গড়ে তোলার ৪০ বছর পর আল-কুদ্‌সের আল-মাসজিদ আল- আক্‌সা গড়ে তোলা হয়। যদিও ইতিহাসবিদদের মধ্যে এই নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে যে কোন নবী আগে ও কখন এইগুলো তৈরি করেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই যে এই দুইটি মাসজিদ

> তাহলে নবীদের এই ধরনের শত্রুরা কিভাবে ঐ একই নবীদের ভুমির উপর অধিকার দাবি করে?

## যতক্ষণ পর্যন্ত না

“ইসরাইল”কে মানচিত্র থেকে মুছে না ফেলা হয়, গাজা থাকবে আমেরিকার দায়িত্বে অনুমোদিত আধুনিক কেন্দ্রীয় শিবির এবং ইহুদিদের নাটকীয় অজুহাতে নির্বিচারে গোলাবর্ষনের লক্ষ্যবস্তু।

নবীগণ তৈরি ও নবায়ন করেছেন। আল- মাসজিদ আল-হারামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নবী ইব্রাহীম ও তার পুত্র ইসমাইল (আঃ), পরবর্তীতে যাকে ইহুদীরা (এবং খ্রিষ্টানরা) অপমান ও অপদস্থ করে তাদের আহবার (আলেম), রুহবান (পীর দরবেশ) ও অনুলেখকদের লেখা পবিত্র গ্রন্থ ও আল্লাহর গুনাগুণ নিয়ে মিথ্যাচার সম্বলিত সংযোজন ও বিয়োজনের উপর ভিত্তি করে। এদিকে, আল-মসজিদ আল-আক্সা নবায়ন ও সম্প্রসারণ করেন মহান নবী সুলাইমান (আঃ) যাকে ইহুদী (এবং খ্রিষ্টানরা) শুধুমাত্র জাদুবিদ্যা, মুর্তিপুজক হিসেবে দোষারোপ, তার পিতার উপর ব্যাভিচারের অভিযোগ ও তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করেনি, এমনকি প্রথমেই তারা তাকে এবং তার পিতাকে নবী হিসেবে অস্বীকার করে তাদেরকে উপহাস পূর্ণভাবে “রাজা” সুলাইমান ও “রাজা” ইসমাইল ডাকা শুরু করে। তাহলে নবীদের এই ধরনের শত্রুরা কিভাবে ঐ একই নবীদের ভুমির উপর অধিকার দাবি করে?

হিব্রু নবীদের আগমনের পরবর্তী সময়ে এবং খ্রিষ্টের আগমনের আগে (আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষন করুন) এবং এর পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অংশ শাসন করেন বহু দেবতায় বিশ্বাসী ও জালিম শাসকরা, কিছু লক্ষণীয় ব্যতিক্রম দেখা যায় ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যতক্ষন পর্যন্ত এটি মুসলিমদের শাসনামলের মধ্যে ছিলো দ্বিতীয় খলিফা উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর নেতৃত্বে- অথবা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উত্তারাধিকারীর নেতৃত্বে। উমার (রাঃ) আল-মাসজিদ আল-আক্সা পরিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন যা খ্রিষ্টানরা (ঐ সময়ে কোন ইহুদি ওখানে ছিলো না) আবর্জনা ফেলার আস্তাকুড় হিসেবে ব্যবহার করতো।

আল-কুদ্স দখল ও লুট হওয়ার আগে ফিলিস্তিন ও আল-আক্সা এবং এর অধিবাসীরা (মুসলিম শাসকের অধিনে থাকা ইহুদিরা) মুসলিমদের হাতে উন্নতি লাভ করে। প্রথম ক্রুসেডের সময় ১০৯৯ সালে বাইবেলে বিশ্বাসী, পোপ অনুসারী, পোপ পুজারি, মৌলবাদী খ্রিষ্টানদের দ্বারা ইহুদিরা নিহত হয়।

৮৮ বছর পর, ১১৮৭ সালে, মহান নেতা সালাহুদ্দিন আল-আয়ুবি ইসলামের জন্য একে পুনরুদ্ধার করেন। তিনি আল-মাসজিদ আল-আক্সা পরিষ্কার ও পুনপ্রতিষ্ঠা করেন, যা কিনা ক্রুসেডাররা তাদের ঘোড়া রাখার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করতো। এটা ছিলো ১৯১৬ সালে আবার ফিলিস্তিন ইহুদি ও ক্রুসেডারদের হাতে হারিয়ে যায়, এই সময়ে ব্যালফর ঘোষনা ও সাইকস-পিকট চুক্তিপত্রের পথ ধরে।

কোন কোন পাঠক হয়ত কৌতুহলী হবেন যে কেন আমি ফিলিস্তিন ও আল-আক্সার ইতিহাসের সারমর্ম দিলাম। আমার উত্তর হল যে আপনি অবাক হবেন এটা জেনে যে ফিলিস্তিনের ইসলামিক ইতিহাস সম্পর্কে কত মুসলিম অজ্ঞাত এবং এভাবেই হয়ত এই ব্যাপারে ইহুদি ষড়যন্ত্র স্থান করে নিয়েছে।

ফিলিস্তিনে ইহুদিদের দখল এবং ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের সুশৃংখল যন্ত্রণাদায়ক গণহত্যা- (সাম্প্রতিক প্রকাশিত গাজার উপর ইসরাইলের চলমান আগ্রাসন যা কিনা যতদুর সম্ভব ২০০০ এর বেশি মুসলিমের প্রান নিয়েছে এবং ৮০০০ এর বেশি আহত হয়েছে) এটি সাইকস-পিকট চুক্তির অনিবার্য পরিণতি, যা ১৯১৬ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া গোপনে তৈরি করে এবং ১৯১৭ সালে বিশ্ববাসীর কাছে তা প্রকাশ পায়। এই অনিষ্টকর চুক্তি একদা শক্তিশালী, সংযুক্ত

মুসলিম জাতিকে ডজন খানেক দুর্বল ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত করেছে যা শাসিত হয়েছে পশ্চিমাদের প্রতিনিধি ও দালাল দ্বারা। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ধারাবাহিক দখলদারিত্ব ও নিয়মিত তাদের নিষ্ঠুর দমন এবং জনসাধারনের অপমান সত্ত্বেও শাস্তি থেকে অব্যাহতি এবং কোন সমুচিত জবাবের ভয়হীনতা অথবা তাদের অপরাধগুলোকে গণ্য না করা হল জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত ও সনদপ্রাপ্ত ছোট ছোট রাষ্ট্রের অনুমোদনের প্রত্যক্ষ ফলাফল, যা তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আমেরিকান নেতৃত্ব, ইসরাইল প্রভাবিত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করে এবং তার অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর, বিশেষত "ইসরাইল" এর সার্বভৌম ক্ষমতা ও আঞ্চলিক সাধুতার আত্মপক্ষ সমর্থন ও সংরক্ষন করার জন্য প্রয়োজন এই সকল অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র। এটা শুধুমাত্র সাইকস-পিকট চুক্তি ও জাতিসংঘের সনদ রদ করা দ্বারা, এবং সকল একই রকম ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র যেমন ফিলিস্তিন ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশ যেমন স্পেন থেকে পূর্ব তুর্কিস্তান পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব এবং তাদের মুসলিম জনগন নিরাপদ, সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে ইসলামিক খলিফার ছায়াতলে।

- যতক্ষন পর্যন্ত না "ইসরাইল"কে মানচিত্র থেকে মুছে না ফেলা হয়, গাজা থাকবে আমেরিকার দায়িত্বে অনুমোদিত আধুনিক কেন্দ্রীয় শিবির এবং ইহুদিদের নাটকীয় অজুহাতে নির্বিচারে গোলাবর্ষনের লক্ষ্যবস্তু।

- যতক্ষন পর্যন্ত না "ইসরাইল"কে মানচিত্র থেকে মুছে না ফেলা হয়, ফিলিস্তিনের শিশুরা বেড়ে উঠবে একটি ভয়ার্ত পরিবেশে, তাদের মনের ছাপাখানায় ইসরাইলের বোম্বিং হামলার ভয় এবং তার অনুবর্তী মৃত্যু ও ধ্বংস স্থায়ীভাবে গেথে যাবে।

- যতক্ষন পর্যন্ত না "ইসরাইল"কে মানচিত্র থেকে মুছে না ফেলা হয়, ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা দরিদ্রতার সমস্যায় অনবরত ভুগতে থাকবে এবং সবচেয়ে খারাপভাবে বঞ্চিত হবে, এমন ধরনের বঞ্চনা যেখানে তারা কেবল তাদের ঘরবাড়ি ও স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত নয়, তারা তাদের জীবন ও ভালোবাসার মানুষগুলো থেকেও বঞ্চিত।

- যতক্ষন পর্যন্ত না "ইসরাইল"কে মানচিত্র থেকে মুছে না ফেলা হয়, ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা কেবল তাদের পিতা-মাতা ও সহদোরদের চোখের সামনে গুলিবিদ্ধ হতে দেখবে না, এমনকি পিতা-মাতারাও তাদের বাহুডোরে আবদ্ধ সন্তানদের হত্যা ঠেকাতে পারবে না।

- যতক্ষন পর্যন্ত না "ইসরাইল"কে মানচিত্র থেকে মুছে না ফেলা হয়, গাজাতে ফিলিস্তিনি বাবা-মা অবিরত তাদের সন্তানদের ধীরগতি ও দুর্দশাগ্রস্থ মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে পাবে, কারন তারা গাজার কর্মচারীবিহীন ও সরবরাহবিহীন হাসপাতাল গুলোতে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অসমর্থ; এবং এটা অনুমেয় যে এই হাসপাতাল গুলো হচ্ছে ইসরাইলী বিমানের আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অবশিষ্ট গুলো, এবং এগুলোকে আশ- শিফা হাসপাতালের প্রধান চত্বরের মত লক্ষ্য করে বিমান ছুড়া হয়নি যেমনটা করা হয়েছিলো ঈদ-উল-ফিতরের প্রথম দিন (একটি খেলার মাঠকেও লক্ষ্য করা হয় যেখানে ৮ জন শিশু মারা যায়)।

- যতক্ষন পর্যন্ত না "ইসরাইল"কে মানচিত্র থেকে মুছে না ফেলা হয়, এই ধরনের অবর্ননীয় অপরাধ অনবরত সংঘটিত হতেই থাকবে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ছায়াতলে যা উন্মুক্ত সহযোগিতা ও মর্যাদা হানিকর নীরবতার মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে;

এখানে আমি আমিরুল মু'মিনিন মোল্লাহ মুহাম্মদ উমারের (হাফিজাহুল্লাহ) ১৪৩৫ হিজরির ঈদ-উল-ফিতরে দেওয়া বার্তার উদ্ধৃতি দিবো, যেখানে তিনি বলেন, "আমরা নিন্দা জ্ঞাপন করছি ও অভিযোগ করছি দখলদার সত্তা ইসরাইলের নিষ্ঠুর আগ্রাসনের প্রতি যা এই পবিত্র রমাদান মাসে সংঘটিত হয়েছে নিপীড়িত হাজার হাজার ফিলিস্তিনি জনগনের বিরুদ্ধে যারা নিহত, আহত ও উদবাস্তু হয়েছেন। আমরা আহবান জানাই এই বিশ্বকে - বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বকে - গাজায় ইসরাইলীদের জুলুমের প্রতি চুপ করে থাকবেন না, জুলুমের প্রতি চুপ করে থাকা হচ্ছে অন্যায় এবং এটা হার কেই নির্দেশ করে; এই নিপীড়ন ও আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য অবশ্যই জরুরী এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে নতুবা গাজা এবং বিশ্ব নিরাপত্তা আরও খারাপের দিকে যাবে।"

আমরা বর্তমানে মোকাবেলা করছি মিলিত বর্বর শত্রুদের

যাদের কার্যক্রমের পরিধি মানবিকতা, সহবিদ্যমানতা ও মূলদ কথাবার্তার ভাষায় অসংগতিপূর্ণ যা কিনা ভন্ডামি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং তারা বাকি বিশ্বের কাছে দাবি করে যে তারা তাদেরকে মান্য করবে, যদিও তা মানবিকতার সবগুলো নীতিকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের সহাবস্থান চিন্তনীয়।

গাজায় বেসামরিক লোকদের ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, আশ্রয়স্থল, হাসপাতাল এবং বাচ্চাদের খেলার মাঠে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বোম্বিং এবং ইহুদি ও ক্রুসেডারদের নির্দয় আন্তর্জাতিক অবরোধ ও সীমান্তে বাণিজ্যিক অবরোধ চাপিয়ে দেয়া এবং তাদের জোটের নিপীড়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া প্রতিরক্ষার উপায় হিসেবে এবং ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইহুদিদের মিথ্যা নিপীড়নের অভিযোগ ইত্যাদি কারণে কোন মুসলিম তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেনা।

যেকোন প্রকারে বাণিজ্যিক ও আন্তর্জাতিক অবরোধ, আইনসম্মত এবং কার্যকরী সামরিক কৌশল যখন তা আনুপাতিকভাবে প্রয়োগ করা হয় সত্য ও জনসাধারণকে প্রতিরক্ষার জন্য। ইতিহাসের মাধ্যমে দেখা যায় মুজাহিদরা অনেক সময় সফলভাবে এই ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছে, যেমন নবী (সঃ) ইহুদিদের গোত্র বনু কুরাইজার উপর অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে নিয়ম সম্মত ও কার্যকর সামরিক কৌশল যখন তা সত্য ও পক্ষের লোকদের নিরাপত্তায় আনুপাতিক হারে ব্যবহার করা হয় । ইতিহাসে মুসলিম সেনাবাহিনী এই কৌশল অসংখ্যবার সফলভাবে প্রয়োগ করেছে,

- বনু কুরাইজার ইহুদিদের উপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবরোধ,
- কনস্টান্টিনোপল এর উপর অটোমানদের অবরোধ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত, এবং
- ইরাকি মুজাহিদিনদের বাগদাদ ও গ্রিন জোনে ক্রুসেডার ও এর দালালদের বিরুদ্ধে অবরোধ, যে অবরোধ এই কোয়ালিশনকে দূর্বল ও কার্যকরভাবে পরাজিত করতে মূখ্য ভূমিকা রেখেছে।

ফিলিস্তিনি শহর ও গ্রামের উপর ইসরাইলের উপর্যুপরি আগ্রাসন এবং গাজার অরক্ষিত জনগনের উপর দমনমূলক নিষেধাজ্ঞা এভাবে চলতে পারে না যেভাবে মুসলিম বিশ্বকে দূঃখজনকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আমাদের সময় এসেছে আগুনকে আগুন দিয়ে মুকাবিলা করার, ইহুদী ও ক্রুসেডারদের উপর আমাদের নিজস্ব অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার এবং তাদের অর্থনীতির হৃদপিণ্ড ও রক্তপ্রবাহ, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থায়ন দ্বারা উপস্থাপিত হয়, তার উপর আঘাত করা, সেখানেই আঘাত করা যেখানে ব্যাথা লাগে।

- শত্রুরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বানিজ্যকে মুজাহিদিনদের অকার্যকর করে দিতে হবে, অথবা
- কমপক্ষে, এর খরচ বাড়িয়ে দিতে হবে,
- ইসলামি সামুদ্রিক এলাকা, বন্দর, খাল এবং প্রনালীতে তাদের মালবাহী জাহাজ ও নৌ-বানিজ্যের উপর আঘাত হেনে,
- গভীর সমুদ্রে, এবং তাদের নিজস্ব সমুদ্র সীমায়, এবং তাদের শিপিং রুটকে যখন, যেখানে, যেভাবে পারা যায় বিপর্যস্ত করে।

আল্লাহর অনুগ্রহে, মুসলিমরা
আমেরিকা এবং পাপিষ্ঠদের
জোটকে অন্ততপক্ষে দুইটি
গুরুত্বপূর্ন যুদ্ধে পরাজিত
করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু
আমাদের এই বিভ্রমে পড়ে
যাওয়া যাবে না যে
ক্রুসেডারদের ইরাক থেকে
বিতাড়ন এবং এই বছরেই
আফগানিস্তান থেকে সম্ভাব্য
বিতাড়ন মানেই বৃহত্তর
আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সমাপ্তি।

তাদের যেকোন জাহাজ আক্রমনের জন্য বৈধ নিশানা। রপ্তানী হচ্ছে যেকোন দেশের অর্থনীতির জন্য প্রধান উপাদান, এমনকি পশ্চিমাদের অর্থনীতির জন্যও। অমূল্য তেল ও খনিজ সম্পদ যা শত্রুরা আমাদের থেকে চুরি করছে এবং তা দিয়ে তাদের যুদ্ধনীতি সচল রাখছে, মুজাহিদিনদের তার সরবরাহকে বন্ধ করতে হবে।

মুজাহিদিনদের ইসলামি ভূমিতে ক্রুসেডারদের পরিচালিত তেল-কূপ স্যাবোটাজ করতে হবে এবং পাইপ লাইনগুলোর মাধ্যমে তেল উপকূলীয় এলাকাতে পৌছানো ও শত্রুর হাতে পড়ার পূর্বেই তা ধ্বংস করতে হবে, শত্রুর নিজস্ব সমুদ্রসীমায় তাদের সুপার-ট্যাঙ্কার ডুবিয়ে দিয়ে ও অয়েল-রিগ গুলো স্যাবোটাজ করে এবং এভাবে তাদের আকর্ষনীয় লাভজনক মৎস্য শিল্প ধ্বংস করে দিতে হবে যেভাবে তারা আমাদেরটা করেছে গাজা, সোমালিয়াও অন্যান্য স্থানে।

একই সাথে, মুসলিমদের অবশ্যই আমেরিকান, ক্রুসেডার ও ইহুদী পন্য, গাড়ি, কম্পিউটার, চকলেট, পোশাক বয়কট করতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই সর্বতোভাবে স্থানীয় বিকল্প পন্য উৎপাদন, ক্রয় ও সমর্থন করতে হবে।

**পন্যঃ** প্রধান পশ্চিমা কোম্পানি ও বহুজাতিক কর্পোরেশন যেমন ওয়াল মার্ট, ম্যাকডোনাল্ড'স, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, মাইক্রোসফট, নেসলে, ইউনিলিভার ইত্যাদি হচ্ছে আধিপত্যবাদী বিশ্বায়নের প্রতীক যা চিহ্নিত হয় দূর্বল ও দরিদ্রের শোষনের মাধ্যমে এবং স্থানীয় অর্থনীতির ধ্বংসের মাধ্যমে। মুসলিম হিসেবে এবং মুজাহিদিন হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যেকোন মূল্যে এটা থামানো।

**ব্যাংকঃ** মুসলিমদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করতে হবে, কারন শুধু এই নয় যে এগুলো তথাকথিত 'ইন্টারেস্ট/ইউজুয়ারি' (সুদ/চক্রবৃদ্ধি সুদ) এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যার ব্যবহারকারি, অপ-ব্যবহারকারি ও সুবিধাভোগিদেরকে আল্লাহ তাঁর সাথে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন (দেখুন কুর'আন ০২ : ২৭৫-২৮১)।

পশ্চিম-চালিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যাংক যা মুসলিম ও পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষদের দাস বানিয়ে রাখার এক কার্যকর উপায়। প্রকৃত পক্ষে, মুসলিমদের অবশ্যই সোনা, রূপা ও অন্যান্য মৌলিক পণ্যসামগ্রীকে বিনিময়ের মান ও মাধ্যম হিসেবে পুনঃপ্রবর্তনের জন্য চেষ্টা শুরু করতে হবে, শিল্প উৎপাদনকে আকৃষ্ট করার জন্য পণ্য-বিনিময় প্রথা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে হবে যার ভিত্তি হবে স্থানীয় ইসলামি অর্থনীতি এবং যাতে করে শত্রুর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উপর সক্ষমতা অর্জন করতে পারি।

স্বর্ণমান বিনিময় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন দরকার এই জন্য যাতে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপরে আমরা জয়ী হতে পারি যা শূন্য থেকে মুদ্রা তৈরী করে, আমাদের বাজার ও অর্থনীতিকে পশ্চিমাদের সাথে বেধে ফেলে, ওয়ার্ল্ডব্যাংক, International Monetary Fund, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি সংগঠনের করুনার উপর আমাদের নির্ভরশীল করে তোলে এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং অন্যান্য অসংখ্য ধরনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, সরকার ও ধর্মকে অরক্ষিত করে রাখে।

একটি প্রশ্নঃ কেউ বলতে পারে, 'কুফরের আন্তর্জাতিক জোটের পরাজয় ও বৃহত্তর ইসলামি রাষ্ট্র গঠন ছাড়া কী মুসলিমদের এই আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার জাঁতাকল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যৌক্তিক হবে?' আমার উত্তর হবে, 'হ্যাঁ, ইসলামের বিজয়ের জন্য মুসলিমদের নিজেদেরকে আর্থিক এবং অর্থনৈতিকভাবে (financially and economically) প্রস্তুত করা সম্পূর্ন ভাবে যৌক্তিক, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেভাবে নিজেদেরকে ধর্মীয়, সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রস্তুতি, সংগঠিত ও শিক্ষিত করতে উৎসাহ দেই ঠিক সেভাবেই!'

আজ, অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে মুসলিমরা খুব ভালভাবে বুঝতে পারছে, তারা কোন দিনও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না যার স্বপ্ন তারা দেখে, যদি না তারা সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বৃহৎ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে তাদের দেশগুলোকে মুক্ত করতে না পারে।

সুমাইয়া গানৌশি, The Guardian পত্রিকায় "Backstage, it's business as usual" শিরোনামের প্রবন্ধে লেখেন, যা তিন বছর আগে আরব বিশ্বের জনসমর্থিত বিদ্রোহ শুরুর পরেই প্রকাশ পায়, এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি ব্যবহার করে আরব অঞ্চলের প্রকাশঃমান বিদ্রোহের ধ্বংস সাধন ও অন্তর্ঘাত (sabotage) এর পশ্চিমা পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

তার প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উল্লেখ করছি –

"পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য পশ্চিমারা শুধু কঠোর সামরিক শক্তি মোতায়েন করছে না। বিশ্বব্যাংক ও IMF এর মাধ্যমে এটা তার অর্থনৈতিক বাহুকেও প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট যোয়েলিক একদল আরব অ্যাক্টিভিস্ট-দের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের এই পরিবর্তনকে 'নিজস্ব গতিপথের আকর্ষনীয় মূহুর্ত' (striking moment engendering its own momentum) বলে প্রশংসা করে। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা নিয়ে তাকে যখন বলতে শুনি, কেউ তাকে নিষ্পাপ, স্বাধীন একজন বিশ্লেষক ভাবতে পারে যার অর্থনৈতিক ফাঁদগুলোর ব্যাপারে কোন ধারনাই নেই যার কবলে পড়ে এই অঞ্চলগুলো সংগ্রাম করছে।

এই প্রচারনা হচ্ছে যা ঘটছে তার একটি মৌলিক অংশ লুকিয়ে রাখার ছলনা – জনগন কেবলমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত রাজনৈতিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি, বরং IMF ও বিশ্বব্যাংকের চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক মডেলের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছে এবং তিউনিসিয়া ও মিশরের ক্ষেত্রে EU (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন) এর কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাবের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছে।

তিউনিসিয়াতে (প্রথম আরব দেশ যেটা ১৯৯৫ সালে ইউরো-মেডিটারনিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এগ্রিমেন্টে সই করে) ৬৭ শতাংশেরও অধিক সরকার নিয়ন্ত্রিত ফার্ম এখন বেসরকারি-করণ হয়েছে, যেখানে মিশরে এই সংখ্যা ৩১৪ এর মধ্যে ১৬৪টি। এই পদক্ষেপগুলো দেশগুলোর অর্থনীতিকে ঋণে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে, এভাবে আমেরিকা ও EU এর হাতে জিম্মী হয়ে গেছে।''

এবং এটা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রনে রাখার অশুভ চক্রের প্রথম ধাপ! সরকারি মালিকানাধীন ফার্মের বেসরকারি-করণ নীতির প্রকৃত মানে কি তা বোঝার জন্য এবং অন্যান্য নব্য-ঔপনিবেশিক নীতি যে কতটা নিপীড়ন মূলক তা বোঝার জন্য আমি জন পারকিন্স এর 'কনফেশন অফ অ্যান ইকোনোমিক হিটম্যান' ও 'দা সিক্রেট হিস্টোরি অফ আমেরিকান এম্পায়ার' এই দুটি বই এর কথা বলবো।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুমাইয়া গানৌশি উল্লিখিত জনগনের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা সত্ত্বেও, তিউনিসিয়ার তথাকথিত বিপ্লবী সরকার (যার নেতৃত্বে আছে ছদ্ম-ইসলামিক রেঁনেসা পার্টি যার নেতৃত্বে আছে সুমাইয়ার পিতা রশিদ গানৌশি ও স্বামী রফিক আব্দুস সালাম) এবং তার সাথে নতুন/পুরোন মোড়কের ঈজিপ্ট, লিবিয়া ও ইয়েমেনের, সাবেক শাসকগুলোর বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও IMF এর কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার অভ্যাস বজায় রাখার চাইতেও বেশি করছে এবং আমেরিকা, EU ও অন্যান্য দাতা দেশগুলো থেকে আরও বেশি করে শর্ত-যুক্ত অনুদান গ্রহন করছে (সাবেক শাসকদের কাউন্টার-টেররিজম নীতির ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাওয়ার কথা বাদ দিলাম, এটার আলোচনা অন্য দিন হবে), এতে করে প্রকৃত পরিবর্তনের প্রতি জনগনের আশাকে বিলম্বিত করছে এবং সেই সাবেক অভিজাতদের শাসনের পুনরুত্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই বিদ্রোহের যে উদ্দেশ্য তা ভুলিয়ে দিচ্ছে।

তবে যাই হোক, পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যে একটা ঐকমত্য আছে যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখন সর্বাধিক ভঙ্গুর ও অরক্ষিত অবস্থায় আছে, বিশেষ করে আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশ গুলোতে যে উত্থান ঘটছে তার আলোকে এবং বিশাল পরিমানে চক্রবৃদ্ধি সুদের বৃদ্ধিতে ইউরোপে ও আমেরিকায় যা প্রচন্ড রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় এর দিকে পশ্চিমা বিশ্বকে ধাবিত করছে।

এই কারনেই পশ্চিমা নেতারা এই ব্যবস্থার যোগ্যতা এবং ভবিষ্যত পশ্চিমা সভ্যতার উপর এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেই যাচ্ছে, তাদের মধ্যে কেউ তো এটাও বলছে যে এই ব্যবস্থার গোড়াতেই গলদ আছে এবং এতে করে ব্রিটন-উডস মডেলের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এই রকম একটি সংস্কার অবশ্যই পশ্চিমা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনের কিছু অপূরনীয় হাতিয়ারকে ফেলে দিতে হবে, আমেরিকা ও তার ক্রুসেডার জোট এটা কখনই মেনে নিবে না, তার মানে এই তিলে তিলে ধ্বংস করার যুদ্ধ চলতেই থাকবে, যা ইনশা আল্লাহ তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শেষ করে দিবে, এবং এরই সাথে তাদের আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-ও। অর্থনৈতিক অস্ত্র হলো এমন এক তলোয়ার যার দুই পাশেই ধার রয়েছে, মুসলিম বিশ্বের মতই পশ্চিমাবিশ্বও এই ধরনের যুদ্ধের ঝুঁকির মুখে আছে।

**করনীয়ঃ** এই ঐতিহাসিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মুহূর্তে প্রত্যেক মুসলিমের কাছে এটাই দাবী যে সে লড়াইয়ে অংশগ্রহন করবে এবং তার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে ইহুদীবাদী ও ক্রুসেডারদের জীবন বিপর্যস্ত করবে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে অবদান রাখবে। আজকে, আমরা ধন্যবাদ জানাই আল্লাহকে, তারপরে, মুজাহিদিনদের আত্মত্যাগ ও মরণপণ সংকল্পকে এবং তাদের দূরদর্শী নেতৃত্বকে যেমন, আমির-উল-মু'মিনিন মোল্লাহ মুহাম্মাদ উমর (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষন করুন), শহীদ শায়খ উসামা বিন লাদিন (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষন করুন), এবং আমাদের মুজাহিদ আমির শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরি (আল্লাহ তাঁকে সুরক্ষা দিন), যাঁদের কারণে আন্তর্জাতিক কুফরের মাথা, আমেরিকা, আজ এমন-ই এক অভূতপূর্ব দূর্বল অবস্থানে আছে যে এর সাম্রাজ্যের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে গেছে।

আল্লাহর অনুগ্রহে, মুসলিমরা আমেরিকা এবং পাপিষ্ঠদের জোটকে অন্ততপক্ষে দুইটি গুরুত্বপূর্ন যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই বিভ্রমে পড়ে যাওয়া যাবে না যে ক্রুসেডারদের ইরাক থেকে বিতাড়ন এবং এই বছরেই আফগানিস্তান থেকে সম্ভাব্য বিতাড়ন মানেই বৃহত্তর আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সমাপ্তি।

ইসলামিক উম্মাহ আজ অসংখ্য দখলদারিত্ব ও নিষেধাজ্ঞার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে আর ফিলিস্তিন এখনও নির্দয় ইহুদীদের দয়া ও নিয়ন্ত্রনে বেঁচে আছে, রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারিরা আক্রমনের মুখে আছে মালি, নাইজেরিয়া এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক থেকে পশ্চিমে সিরিয়া, ইরাক আর পূর্বে বার্মা, থাইল্যান্ডে এবং মুসলিমরা আছে নব্য-উপনিবেশবাদ, স্বৈরতন্ত্র, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, দ্বীনহীনতা, এবং কুফরের অন্ধ অনুকরন ও অনুসরনের পথে, আমাদের সামনে যে পথ তা মোটেও সহজ নয়।

কিন্তু যদি প্রত্যেকেই ইসলামের শত্রু ও মুসলিমদের নির্যাতকদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে আন্তরিকতার সাথে অংশ নেয়, একই সাথে তার দ্বীন প্রয়োগের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয় এবং নিজেকে ও নিজের আশে-পাশের মানুষদের শিক্ষিত ও সংশোধন করে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ইনশা আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করবেন এবং আমাদের বিজয় দান করবেন শত্রুদের উপরে এবং আমাদের নফসের উপর, এবং আমাদের ঐক্য দান করবেন এবং আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করবেন খিলাফত যার জন্যই আমরা কাজ করছি।

প্রিয় মুসলিম, শত্রুদের উপরে জয়ী হওয়া এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি শুধু সশস্ত্র লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল হালাল উপায় ও উপকরন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে সামরিক প্রচেষ্টা সমর্থন পাবে, শক্তিশালী হবে ও অগ্রগামী হবে এবং মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য এই যুদ্ধে আমাদের সফলতা দান করবে।
তাই, কেন দেরী করছেন?
জিহাদে আপনার দায়িত্ব পালন করুন এখনই...
সেটা সামরিক, আর্থিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, অনুপ্রেরনামূলক বা অন্য যা-ই হোক না কেন।
ধৈর্য্যশীল ও অটল থাকুন, এবং আপনার ভাইদের অন্তরে তা ধীরে ধীরে প্রবেশ করান,
কারন, যুদ্ধ কিন্তু এখনও শেষ হয়নি... ■

*ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।*

প্রিয় মুসলিম, শত্রুদের উপরে জয়ী হওয়া এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি শুধু সশস্ত্র লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল হালাল উপায় ও উপকরন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে সামরিক প্রচেষ্টা সমর্থন পাবে, শক্তিশালী হবে ও অগ্রগামী হবে এবং মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য এই যুদ্ধে আমাদের সফলতা দান করবে।

পাকিস্তান আর্মি সম্পূর্ণরূপে একটি ইসলামিক ও জিহাদি আর্মি... এর একমাত্র সমস্যা হচ্ছে এর অধিকাংশ রেজিমেন্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই গঠন করা হয়েছে কুখ্যাত ব্রিটিশ জেনারেল 'লর্ড' কিচেনারের হাতে। এর গঠনের পর প্রথম আর্মি চিফ ছিলেন ফ্রাঙ্ক মেসারভি, একজন ব্রিটিশ জেনারেল। ডগলাস ডেভিড গ্রেসি, আরেকজন ব্রিটিশ জেনারেল ছিলেন এর দ্বিতীয় আর্মি চিফ। ব্রিটিশ অফিসার ব্রিগেডিয়ার এঞ্জেল এর প্রাথমিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি' এর গোড়াপত্তন করেন। আরেক জন ব্রিটিশ কর্নেল গ্রেন্ট টেইলর 'এসএসজি' – এর কমান্ডো ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। খুব একটা যৌক্তিক মনে হচ্ছে না?

যদি দুই অভিজাত ইংরেজ 'স্যার' ডুরেন্ড এবং 'স্যার' রেডক্লিফ একটি ইসলামি রাষ্ট্রের (ইসলামের দূর্গ) সীমা নির্ধারণ করতে পারেন, তাহলে কেন কিছু ব্রিটিশ ব্যক্তি একটি ইসলামিক আর্মির ভিত্তি দাঁড় করাতে পারবেন না?

# গল্পের অপর পার্শ্ব

হাসান ইউসুফ

ব্যবধান কিন্তু স্পষ্ট এবং প্রবলতর। ধেঁয়ে আসছে একটি মিসাইল যার প্রোপেলারের কর্ণবিদারী শব্দ ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে খুবই স্পষ্ট; মাত্র তিন সেকেন্ড যা মনে হচ্ছে অনেক দীর্ঘ এবং......একটি বিকট আওয়াজ

আমেরিকানরা বাগরাম বিমান ঘাঁটির নিরাপদ দূরত্ব থেকে আরও একটি হেলফায়ার মিসাইল নিক্ষেপ করেছে। যা ভূমিতে ধোয়া, ধূলি এবং নিরপরাধ উপজাতীয়দের পোড়া দেহাংশ তৈরি করেছে। শহীদের রক্ত হতে আসা অতি উচ্চমানের সুগন্ধি মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর রাসূল (সা.) এর এন্টিক্রাইস্ট বা দাজ্জাল সম্পর্কে সেই উক্তি– "তার সাথে থাকবে একটি জান্নাত এবং একটি জাহান্নাম; তার জান্নাত হবে প্রকৃত জাহান্নাম এবং তার জাহান্নাম হবে প্রকৃত জান্নাত"।[1]

সাত বছর ধরে পবিত্র ভূমিতে চলমান ড্রোন হামলার এটাই বাস্তবতা, নির্বোধ লোকেরা যে ভূমিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে।[2] আমরা এখানে বের করার চেষ্টা করব সাধারণ মানুষের উপর ড্রোন হামলার প্রভাব এবং পাকিস্তান আর্মি কিভাবে এই ঘৃণিত কাজ করে চলেছে।

সাত বছর ধরে আমরা শুনে আসছি আমেরিকান ড্রোনগুলো কিভাবে সার্বভৌম দেশসমূহের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে। আফগানিস্তান সীমান্তে থাকা হাজার হাজার বোবা সৈন্য, গোয়েন্দা আমেরিকানদের অনুমতি ছাড়াই পাকিস্তান আকাশ সীমায় ঢুকে অপারেশন চালিয়ে নির্বিঘ্নে ফেরত যেতে সাহায্য করছে। বলা হয়– "তুমি কিছু মানুষকে কিছু সময় বোকা বানাতে পার, সব মানুষকে সব সময় নয়"। আমেরিকানরা পর্যন্ত আইএসপিআর (ISPR), পাক রাজনীতিবিদ এবং পররাষ্ট্রদপ্তরের কপটতায় খুশি হতে পারছিল না। এরই মধ্যে "সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে" এই অপ্রিয় মন্ত্র কিছু আমেরিকান অফিসারকে হতাশ ও অবহনযোগ্য করে তুলল। কপটতার এই পর্দা সরতে বেশী সময় লাগল না যা ইসলামাবাদের চাকররা তৈরি করেছে। যখন পাকিস্তানী ক্যাম্পগুলো থেকে মরণাস্ত্র উপজাতি এলাকায় নেয়া হয়, আমাদেরকে শোনানো হচ্ছিল ড্রোন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে না।

---

(1) (১) হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "দাজ্জালের বাম চোখ কানা, চুল কুকড়ানো। তার নিকট থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম; তার জহান্নামই হলো জান্নাত এবং জান্নাতই হলো জহান্নাম।"
মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, যিকরুদ-দাজ্জাল ওয়া সিফাতুহু ওয়ামুন মা'আহু: হাদীস নং: ৫২২২, বুখারি: হাদিস নং, ৬৫৯৭
আরো দেখুন: কিতাবুল ফিতান, যিকরুদ-দাজ্জাল অধ্যায়, হাদিস নং, ৬৫৯৭

(2) পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু এটা শুধুমাত্র গল্পের একটি অংশ। জনগণকে এটা বোঝানো হচ্ছে যে ড্রোন নির্দিষ্ট জায়গায় হামলা করে সবার দেখা ড্রোনের এক চোখ দিয়ে এবং পাকিস্তান আর্মি ড্রোন প্রতিহত করে এবং গোয়েন্দাদের এক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়। অত্যন্ত সততার সাথে জনগণের কাছ থেকে লুকানো হচ্ছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এবং আইএসআই এর কাজ যারা ড্রোন হামলার জন্য টার্গেট ঠিক করে দেয়, সন্ত্রাসীদের দিয়ে ড্রোন হামলার জন্য চিপ বসিয়ে নিয়ে তাদের অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করে। এই কাজের বিনিময়ে আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ তারা পাচ্ছে।

একটি সফল ড্রোন হামলার পিছনের ঘটনা অনেকেরই অজানা। এই দেশী কুলাঙ্গাররা ড্রোন হামলার জন্য দরকারী ডিভাইস গুলো বাড়িতে, গাড়িতে রাখে যার ফলে এই ড্রোনগুলো লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত হানে। এই কুলাঙ্গাররা এর বিনিময়ে কিছু অর্থ পায় সর্বোপরি জাহান্নামের টিকেট পায়।

কিছুদিন আগের রিপোর্ট হতে দেখা যায়, আমেরিকানরা ওয়ানা ক্যাম্প থেকেই পুরো মিশন পর্যবেক্ষণ করছে। SSG-এর একটি কোম্পানী সেখানে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল। আমেরিকানরা যে জায়গায় অবস্থান করে সেখানে সাধারণ সৈন্যদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

আরেকটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ড্রোন হামলার জন্য সেখানে একটি কন্ট্রোল রুম রয়েছে যা আমেরিকান ও পাকিস্তানি সৈন্যরা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যা মীর আলি নামক ক্যাম্পেও রয়েছে। সেখান থেকে সবসময় ড্রোনের গতিবিধি কন্ট্রোল করা হয়।

পাকিস্তান আর্মির মেজর হতে শুরু করে উচ্চপদস্থরা পর্যন্ত এই লাভজনক খেলায় জড়িত। এরাই সেইসব কুলাঙ্গার যারা চালকবিহীন ড্রোন সঠিক জায়গায় হামলা নিশ্চিত করে। কি সত্য বলে মনে হচ্ছেনা? তাহলে আসুন এবার আর্মিদের নিজেদের তথ্য উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করি।

২০০৬ এর "Talibanisation of Waziristan" ৮ নং পৃষ্ঠায় "Mil Aspect" শিরোনামে নিচের বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়:-

আমেরিকান লজিস্টিক সাপ্লাই থেকে উদ্ধারকৃত আই আর ট্রান্সমিটার

ম্যানুয়্যাল ও আই আর ট্রান্সমিটার। ড্রোন লক্ষ্য ঠিক করে আই আর ট্রান্সমিটারের দ্বারা।

আইআর ট্রান্সমিটার (বায়ে) আল্ট্রাভায়োলেট ইঙ্ক (ডানে) টার্গেট নির্ধারনে ব্যবহার হয়।

# ...সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিয়ে তোমরা আমেরিকানরা চিন্তিত, আমি নই...

*"জারদারির সাথে হেইডেনের এক ঘণ্টার কথোপকথনে ড্রোন হামলায় সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিয়ে কথা হয়। এতে জারদারি আল-কায়েদার সিনিয়র সদস্যদের হত্যা করতে বলে। CIA কে সবুজ সংকেত দিয়ে একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আশ্চর্যজনক ভাবে বলে-"*

***সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিয়ে তোমরা আমেরিকানরা চিন্তিত, আমি নই"।***

বব উডওয়্যার, ওবামা'র যুদ্ধ, সাইমন স্কাচটার, ২০১০, পৃষ্ঠা ২০

OPS IN LIC ENVMT PECULIAR TO FATA8 নামক রিপোর্টে দেখা যায় কিছু হামলা যেগুলো সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়নি অথচ সেগুলো সফল হয়েছিল। এই রিপোর্টগুলো এমনভাবে তৈরী করা এক দেশের আর্মি আরেক দেশের আর্মিকে সাহায্য করছে যা কেউ সহজে বুঝবেনা। তাদের নগ্ন মিথ্যা এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, এরা দুই দেশের আর্মি হলেও একই সংস্থার মত কাজ করছে। পাকিস্তান আর্মি যেভাবে আমেরিকান আর্মির গোলামী করছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পাক আর্মি যদি আমেরিকান আর্মির গুরখা রেজিমেন্ট হয় তাতে অবাক হবার কিছু থাকবে না। (গুরখা রেজিমেন্ট –ব্রিটিশ আর্মির অধীনে নেপালী যে বাহিনী কাজ করেছিল)।

**"আমরা জাতীয় পরিষদে সুপারিশ করব, সুতরাং চিন্তা করবেন না।"**

Stanford Law School & NYU School Of Law যৌথভাবে তৈরিকৃত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৪ হতে ২০০৭ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার এমন ভাবে আমেরিকান সরকারকে সাহায্য করেছে যাতে আমেরিকানরা ড্রোন হামলার বিষয়টি খুব সহজেই অস্বীকার করতে পারে। কিছু সংখ্যক আর্মি অফিসার হামলায় জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আমেরিকান ড্রোন হামলার পরপরই পাকিস্তান আর্মি এমনভাবে বোমা হামলা করত যাতে কেউ বুঝতে না পারে আমেরকানরাই হামলা করেছিল। আরেকটি নিশ্চিত সূত্র হতে পাওয়া মৃত মেজর জাকাউল হক বলেছিল-একবার আমেরিকানরা তাদের অনুগত পাকিস্তানী অফিসারদের জানাল যে তারা মেহসুদ এলাকার একটি মাদ্রাসায় ড্রোন হামলা করবে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী একই জায়গায় সকাল দশটায় বোম্বিং করল তবে ভুল বোঝাবুঝির কারণে ড্রোন হামলার দুই ঘন্টা পর পাক বিমান বাহিনী বোম্বিং করেছিল। এতে করে ড্রোন হামলায় আহতদের সাহায্যে এগিয়ে আসা লোকজন বোমা হামলার শিকার হয়েছিল। এই দুই হামলায় ৭০ এর মত লোক নিহত হয়েছিল।

২০০৪ সালে উইকিলিকস প্রকাশিত গোপন নথিতেও পাকিস্তানী অফিসারদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি পাওয়া যায়।

একটি নথিতে আরও পাওয়া যায় পাক প্রধানমন্ত্রী আমেরিকান অ্যাম্বাসিকে বার বার বলছে –"এই হামলা যতই চলুক, তাতে কোন সমস্যা নেই, যতক্ষন না পর্যন্ত আসল লোকদের হত্যা করা যায় আমরা জাতীয় পরিষদে সুপারিশ করব, সুতরাং চিন্তা করবেন না।"

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর জাতির প্রতি এই লজ্জাজনক প্রতারণার মধ্যে দিয়েও গল্পের সমাপ্তি হয় না।

# বাজাউরে ড্রোন হামলায় শহিদদের কবর

সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন পোস্টের এক রিপোর্টে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ও আমেরিকার সহযোগিতার কথা প্রকাশ করা হয়। রিপোর্ট অনুসারে, তাদের কাছ পাওয়া তথ্য মতে, সিআইএ গোপনীয় নথি-পত্র ও কূটনীতিক থেকে পাওয়া তথ্য মতে, ড্রোনের লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্য পাকিস্তান সরাসরি জড়িত।

দলিলগুলোর মধ্যে কিছু ফাইল সিআইএ'র সহকারি পরিচালক মিচেল জে. মরেল'র (২০১৩ সালে অবসর প্রাপ্ত) "কথার প্রসঙ্গ" নামে চিহ্নিত যে পাকিস্তানের আমেরিকান দূতাবাসের এম্বাসেডর হুসাইন হাক্কানীকে নিয়মিত পরামর্শ দিতেন। রিপোর্টটি বলে যে, নথিগুলো অতিশয় গোপনীয় হিসাবে চিহ্নিত ছিল এবং পাকিস্তান সরকারের জন্য "কূটনীতিক ব্যাগ" হিসাবে ইসলামাবাদের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়েছিল। নথির কিছু রিপোর্টে ড্রোন আক্রমণে পাকিস্তানের সরাসরি জড়িত থাকার স্বীকৃতি দেয়। উদাহারন স্বরূপ ২০১০ সালের শুরুতে একটি জায়গায় আঘাতের কথা বর্ণিত আছে যা করা হয়েছিল পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে। ঐ বছরই আরেকটি সূত্র বলে, একটি বিস্তৃত এলাকায় হামলা করা হয়েছিল সিআইএ ও পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার মিলিত প্রচেষ্টায়।

### না বলা গল্পঃ ড্রোনের সাথে মানুষের জীবন

বেশীর ভাগ পাকিস্তানির কাছে উপজাতীয় এলাকায় চলমান যুদ্ধ দূরের বিষয়, যার প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে তারা শোনে যখন নিরাপত্তা বাহিনী, দায়িত্বরত অফিসার এবং ন্যাটো'র রসদবহরে পাকিস্তানের ভেতরে আক্রমণের শিকার হয়। বেশীরভাগ পাকিস্তানিই এব্যাপারে সতর্ক না যে, সপ্তাহে ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা উপজাতীয় এলাকা বিশেষ করে ওয়াজিরিস্তানে ড্রোনের চক্কর দেওয়া স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে প্রতিনিয়ত মৃত্যুকে সরণ করিয়ে দেয়।

### "আকাশের দিকে তাকালে আমি লজ্জিত হই..."

-শাইখ আব্দুল বারি

একজন ভাই, শাইখ আব্দুল বারি (আল্লাহ্‌ তার উপর রহম করুন) সম্পর্কে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ননা করেছিল। শাইখ আব্দুল বারি সর্বপ্রথম ১৯৮০ সালে আফগানিস্তান আসেন। শহীদ হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ময়দানে থাকা মুজাহিদীনদের মধ্যে বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। তিনি দৈহিক গড়ন ও উচ্চতার দিক দিয়ে শাইখ উসামা বিন লাদিন (আল্লাহ্‌ উপর রহম করুন) এত কাছাকাছি ছিলেন যে, জিহাদ শুরুর প্রথম বছরগুলোতে ওয়াজিরিস্তানে গুজব ঘুরপাক খেত যে, শাইখ উসামাকে আনজুর আড্ডা'য় দেখা গিয়েছে। তিনি খুব দ্বীনদার ও ধর্ম ভীরু লোক ছিলেন। পরে তিনি ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ওয়ানা'তে ড্রোন হামলায় নিহত হন। আল্লাহ যেন তাকে শহীদ হিসাবে কবুল করেন এবং জান্নাতুলফেরদৌস দান করেন। — আমীন।

একজন ভাই একবার তার সাথে আনজুর আডা'তে সাক্ষাৎ করেন। শাইখ সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন, অন্যান্য মুজাহিদীনদের মত বেশী সতর্কতা গ্রহন করতেন না। ঐ ভাইটি শাইখকে সাশ্রদ্ধ ভাবে সতর্ক হবার পরামর্শ দিলেন আর ড্রোন ঘোরাফেরা করার এলাকা এড়িয়ে চলতে বললেন, কারন আনজুর আডা অনেক ড্রোন আক্রমনের শিকার হয়েছে এবং বেশীর ভাগ সময়ই এখানে শূন্যের উপর ড্রোন ভাসতে দেখা যায়। তখন শাইখ বলেছিলেন, "আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে চারিদিকে শূন্যের উপর ভাসমান ড্রোন শুনতে পছন্দ করি না। আমি যখন উপরের দিকে তাকাই তখন আমি আল্লাহর কাছে লজ্জিত হই এই ভেবে যে, মৃত্যুতো আল্লাহর হাতে, ড্রোনের হাতে নেই।" শাইখের এই উত্তর শুনে ভাইটি হতভম্ব হয়ে পড়ল আর চুপ হয়ে গেল। তার আর কিছু বলার ছিল না।

আল্লাহ্‌ যেন আমাদেরকে এ ধরনের ঈমানী জযবা দেন।

## ...গুপ্তচর ছাড়া ড্রোন শুধুমাত্র উড়ন্ত ক্যামেরা।

"পাকিস্তানের সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন এলাকায় আমেরিকা নজরদারির জন্য মনুষ্য ও যান্ত্রিক উভয় বুদ্ধিমত্তার সংযোগ সাধন করে তাদের যোগাযোগ মদ্ধ্যস্ততা, উপগ্রহ ও ড্রোনের ছবি ব্যাবহারে বড় ধরনের কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, এর মূল কারিগর হল মনুষ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত বার্তা। এটাই প্রেসিডেন্ট বুশ যেকোন মূল্যে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। মূলত ড্রোন হল সুসজ্জিত মিসাইলবাহী উচ্চমাত্রার ভিডিও-ক্যামেরা বিশেষ। ড্রোন দিয়ে সরাসরি টার্গেট আঘাত হানার একমাত্র উপায় হল ভুমিতে থাকা গুপ্তচর যারা সিআইএ (CIA) -কে বলে দেয় কোথায় দেখতে হবে, কোথায় শিকার আর কোথায় হত্যা করতে হবে। **গুপ্তচর ছাড়া, ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত ভিডিও ফাঁকা টেলিভিশন পর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়।** ম্যাক কনেল, এই মনুষ্য উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যিনি একটি ব্যয় বহুল, উচ্চ-বিপযুক্ত কাজে ৫ বছর দায়িত্বরত ছিলেন। এই গুপ্তচররাই ওবামা'র মুল গোপনীয় বিষয় যা ঐ মুহূর্ত থেকে এখনও বজায় আছে। তারাই কিছু দিক দিয়ে দেশকে রক্ষা করার মূল ......।"

বব উডওয়্যার, ওবামা'র যুদ্ধ, সাইমন স্কাচটার, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৪

ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচির সাংবাদিকরা তাদের অফিস পাহারা দিচ্ছে। জাতির বোঝা এইসব সাংবাদিক ৮ বছর ধরে বলে যাচ্ছে ড্রোন শুধু সামরিকদের মারছে। বেসামরিক মানুষ হত্যা, তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস, ব্যবসা নষ্ট হওয়া এইসব সাংবাদিকদের চোখে পরছেনা। ধরে নেন একটা বড় মশা আপনার চারপাশে সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা ঘুরতেছে। আপনি জানেন সে আপনাকে কামড় দিবেনা কিন্তু আপনাকে হত্যা করবে। এই ধরনের অবস্থা স্থানীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

একদম শুরুর দিকে ২০০৬ এর অক্টোবরে দামাদোলায় একটি মাদ্রাসায় ড্রোন হামলা হয়। এতে ৮০ জন শিশু নিহত হয়। ড্রোন হামলা ধামাচাপা দিতে পাক আর্মি তৎক্ষনাত হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করে তাদের মার্কিন প্রভুকে বাচানোর চেষ্টা করে।

তখন থেকেই সাধারন নাগরিক হত্যা চলছে। সাধারন লোকের গাড়ি, বিয়ে অনুষ্ঠান, বাজার, স্কুল এমনকি নারী-শিশু যারা মাঠে কাজ করে তাদের উপরও হামলা হচ্ছে। ওয়াজিরিস্তানের এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে মার্কিন ড্রোন হামলা হয়নি।

### 'যৌথ ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম'.... নাকি নির্বিচার বেসামরিক হত্যা

১০ জুন, ২০০৬ ডাট্টাখেলের একটি খনন এলাকায় শ্রমিকরা নতুন দিন শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা জানত না হাজার মাইল দূর হতে CIA এর ড্রোন অপারেটররা তাদের টার্গেট করে রেখেছিল। কোনো এক অজ্ঞাত কারনে তাদের উপর হামলা হয়। চারটি মিসাইলের আঘাতে ২২ জন নিহত এবং ৪ জন আহত হয়।

আমেরিকানরা কি ক্লাশ্নিকভস, স্নাইপার রাইফেলস এর জায়গায় কুঠার, শাবল, কোদাল দেখে ভয় পেয়েছিল। এর উত্তর কারো জানা নেই? এই ক্ষতকে তাচ্ছিল্লের সুরে বাড়িয়ে দিয়ে পাক আর্মি অভিযোগ করেছিল- "এই হামলা লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র লোকদেরকে কেন্দ্র করে করা হয়েছিল এবং এ আক্রমনে আমরা ৪ টি হেলিকাপ্টার গানশিপ ও আর্টিলারি ব্যবহার করেছি"।[৫]

### ক্ষত যা কখনো শুকায়নি

আরও একটি ঘটনা যা ড্রোন হামলায় বেচে যাওয়াদের শারীরিক-মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ২৩শে জানুয়ারী , ২০০৯ রাতে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্থানীয়

(৪) পাকিস্তান উল্লেখ করে মাদ্রাসার ঐ হামলায় ৮০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে N.Y. TIMES (Oct. 31, 2006), (http://www.nytimes.com/2006/10/31/world/asia/31pakistan.html?_r=1)

(৫) Stanford Law Schooland NYU School of Law, Living Under Drones: Death, Injury and Trauma to Civilians from US Drone Practices in Pakistan (September, 2012), pg 42

এক নেতা মুহাম্মদ খলিলের বাসায় প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা চা চক্রে মিলিত হয়। উপস্থিতির মধ্যে হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী খুসদিল খান, আরব আমিরাতে গাড়ি চালানো মনসুর রাহমান, প্রতিবেশীদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্, শিফাতুল্লাহ, রফিকুল্লাহ ছিল। তার দুজন ভাগিনা আজিজ উর রহমান, ১৬ বছরের ফাহিম উপস্থিত ছিল।

আনুমানিক সন্ধ্যা ৫ টায় তারা মিসাইলের আওয়াজ শুনতে পেল। তৎক্ষণাৎ তাদের মাথা নিচু করল। মিসাইলটি অতিথি খানার মাঝামাঝি এমনভাবে পড়ে যে, রুমটি পুরোপুরিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই সাথে পাশের কিছু বাড়ীও ধ্বংস হয়। হামলায় ১৬ বছরের ফাহিম শুধু বেচে যায়। বাকিদের মৃত দেহাংশ পড়ে থাকে। এই ভয়াবহ হামলায় বেচে গেলেও ফাহিম তার বাম চোখ, একটি কান পুরোপুরিভাবে হারায়। তার শরীরের মুখ ও বামদিক পুরো পুড়ে যায়।

ড্রোন হামলার ফলে এক সময়ের ভাল ছাত্র খলিল এখন ঠিকমত পড়ায় মন বসাতে পারেনা। সে বলে-"ড্রোন হামলা শুরুর পর থেকে আমার মেজাজ অল্পতেই বিগড়ে যায়, সামান্য বিষয়েই রেগে যাই।"

মুহাম্মাদ খলিল তার পরিবারের ৯ জন সদস্য এবং মনসুর রাহমান তার পরিবারের ২ জন সদস্যকে রেখে মারা যায়। উভয় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তারা। ফাহিমের চিকিৎসায় অনেক অর্থ ব্যয় হওয়ায় তার পরিবার তাদের ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি মেরামত করতে পারেনি।[৬]

গত ৯ বছর ধরে চলতে থাকা ড্রোন হামলায় জর্জরিত এইসব মানুষ সব সময় চিন্তিত থাকে। ড্রোন ওয়াজিরিস্তানের অনেক জায়গায় ২৪ ঘন্টা ঘুরতে থাকে। চালকবিহীন এই সব মরনযন্ত্রের অনবরত শব্দের কারনে নিরীহ মানুষজন সর্বদা বিরক্ত বোধ করে। কেউ জানেনা কখন, কোথায় সে হামলার শিকার হবে? অসংখ্য মানুষ ভীত হয়ে পড়েছে, কারন ড্রোন মসজিদ, বিয়ের অনুষ্ঠান, স্কুলগুলোতে পর্যন্ত হামলা করছে। অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছে, তালেবানের ভয়ে নয় বরং ড্রোনের বেসামরিক মানুষ হত্যার ভয়। ডাক্তাররা বলছে স্থানীয়দের মাঝে দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া এসব সমস্যা দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় একজনের অভিযোগ, "ড্রোন আমাদের মনে সব সময় আতঙ্কিত করে রাখে। ঘুমানো কঠিন হয়ে পরেছে। অনেকটা মশার মত। যদিও তুমি তাকে দেখ না কিন্তু সে যে তোমার আশে পাশে এটা নিশ্চিত।[৭]

## ড্রোন হামলায় আহতদের অভিব্যক্তি

**ওয়ালিদ সিরাজ (২২), সে পলিটিক্যাল সায়েন্স এ স্নাতক করেছে এবং বিদেশী ভাষার কিছু কোর্স করছিল, তার অক্ষম হবার আগে। তিনি বলেন,**

"প্রত্যেক দিনের মত আমার বাবা হুজরাতে ঘুমাচ্ছিল ও আমি বই পরছিলাম। হুজরার পরিবেশ শান্ত হওয়ায় এখানে আমার পরতে ভাল লাগে। সে স্মৃতির পাতা উল্টাতে গিয়ে বলে-যখন আমাদের উপর আক্রমন হয়, সাথে সাথে আমার বাবার দেহ কয়েক টুকরা হয়ে যায় এবং সে মারা যায়। আমি ৩-৪ দিন অজ্ঞান থাকি কিন্তু এখন আমি পুরোপুরি পঙ্গু। আমি আগে ক্রিকেট খেলতাম কিন্তু এখন পারি না।"

**নাবিলা রেহমানের দাদি মাঠে কাজ করার সময় যিনি মারা যান। নাবিলা বলে,**

"শোনা যায় কিছু লোক আমেরিকানদের ক্ষতি করেছে, যার জন্য আমেরিকানরা তাদের উপর হামলা করতেছে। কিন্তু আমি বা আমার দাদি তাদেরকি কোনো রকম ক্ষতি করেছি"?

**খালিদ রহিম তার সমাজে তিনি একজন মুরব্বী। তিনি বলেন,**

"ইরাক বা আফগানিস্তানে হামলার আগে আমেরিকার ভৌগলিক অবস্থান কোথায়? তাদের সরকার ব্যবস্থা কেমন? তারা সাধারন মানুষের সাথে কি ধরনের আচরন করে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। কিন্তু এখন আমরা তাদের আচরন কেমন তা জানি"।

**তাহির আফজালের ভাই ড্রোন হামলায় নিহত হন। তিনি বলেন,**

"এইগুলিকে আজগুবি গল্প হিসেবে উড়িয়ে দিলে চলবেনা এইগুলি সত্যিই মারাত্নক। আমাদের উপর যা হচ্ছে তা বন্ধ হওয়া দরকার"।

**খাইরুল্লা জানের ভাই ড্রোন হামলায় নিহত হন। তিনি বলেন,**

"যখন কোন ড্রোন হামলা হয় এবং গ্রামের ৪-৫ জন লোক মারা যায় তখন মনে হয় সবকিছু ছেড়ে দিই। যখন মৃত্যু এতই নিকটে তখন পড়াশুনা দিয়ে কি হবে?"

**ইসমাইল হোসেনের ভাই ড্রোন হামলায় নিহত হন। তিনি বলেন,**

"তার মা সারাদিন দেয়ালে ঝুলানো তার ভাইয়ের ছবি দেখে থাকে আর কাঁদে"।

স্টেন্ডফোর্ড ল স্কুল, লিভিং আন্ডার ড্রোন

(৬) Ibid, পৃষ্ঠা ৭২

(৭) Ibid, পৃষ্ঠা ৮১, সুলায়মান আফরাজের (ছদ্মনাম) সাক্ষাৎকার, পাকিস্তান, ২০১২

Anticipatory anxiety refers to a "complex combination of a future-oriented cognitive state, negative affect, and automatic arousal," involving a "sense of uncontrollability focused on possible future threat, danger, or other upcoming potentially negative effects."

ড্রোন হামলায় আত্নীয়দের হারানো একজন তার প্রতিশোধের কথা এভাবেই বলে, "আমরা আমাদের রক্ত কোনদিন ভুলব না, এর বদলা দুই শত বছর, দুই হাজার বছর , পাচ হাজার বছর ধরে নিব।

ড্রোন হামলার শিকার একজন কিশোর বলে, "আমেরিকা ১৫ হাজার কিলোমিটার দূরের একটা দেশ। আমরা দরিদ্র, আমাদের কাছে তাদের মত কোনো খাবার নেই.... এরপরও তারা কেন যে আমাদের উপর ড্রোন হামলা করছে। আল্লাহই ভালো জানে তারা আমাদের কাছে কি চায়"?

"ইয়াহিয়া যিনি ড্রোন হামলায় বেচে যাওয়াদের একজন বলেন, আমি রাতে ঘুমাতে পারি না, মনে হয় এই বুঝি ড্রোন আসছে। ড্রোন আমার সমস্ত মনন জুড়ে বিদ্যমান। ড্রোনের শব্দ শুনলে আমি আলো জালিয়ে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকি"।[৮]

হারুন কুদ্দুস একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার যিনি প্রথম টার্গেটে বেচে গেলেও দ্বিতীয় টার্গেটে গুরুতর আহত হন। তিনি বলেন, আমরা সব সময় ভয়ে থাকি এই বুঝি আমাদের বাড়িতে বা আমরা যেখানেই থাকি সেখানে হামলা হয়। যখন গাড়ি চালাই, বাড়িতে থাকি, মাঠে কাজ করি কিংবা কার্ড খেলি সব সময় এই ভয় আমাদের মনের মাঝে উঁকি দেয়"।[৯]

ডেভিড রোডস নিওইয়র্ক টাইমস এর একজন সাংবাদিক যিনি তালেবানদের হাতে বন্দী ছিলেন। তিনি বলেন, ড্রোন হামলার মাঝে এভাবে বেচে থাকা জাহান্নাম তুল্য। ড্রোন গুলো সত্যিই ভয়াবহ। যখন এগুলো মাথার উপর ঘুরতে থাকে বোঝার উপায় নেই কোথায় এগুলো আঘাত করবে"।[১০]

গত কয়েক বছরে নতুন ভয়াবহতা হচ্ছে দ্বিতীয় ফাঁদ। প্রথম হামলার পর যখন সবাই আহতদের সাহায্যে এগিয়ে আসে তখন দ্বিতীয়বার হামলা হয়। এর ফলে অনেক প্রাণহানি ঘটে। বার বার এ ধরনের হামলার কারনে কেউ এখন সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। শুধুমাত্র জীবনের ঝুকি নেয়া কিছু লোক ছাড়া।

হায়াতুল্লাহ আইয়ুব গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ৩০০ মিটার সামনের একটি গাড়িতে হামলা হলে তিনি এগিয়ে যান সাহায্যের জন্য। গাড়িতে আহত একজন হায়াতুল্লাহকে পালাতে বলছিল। হায়াতুল্লাহ ভেবে পাচ্ছিলনা কি করবে? তিনি গাড়িটা থেকে একটু সরে গেলে দ্বিতীয় হামলাটি কয়েক সেকেন্ডের ভিতর ঘটে, তাতে হামলার শিকার লোকটি মারা যায়।[১১]

(৮) Ibid, পৃষ্ঠা ৮৪।

(৯) Ibid, পৃষ্ঠা ৮২।
(১০) Ibid, পৃষ্ঠা ৮০।

(১১) Ibid, পৃষ্ঠা ৮০।

# ডাট্টাখেলের নৃশংসতা

এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, এখানে অল্প কিছু হামলার শিকার মানুষের কথা বলা হল। যা আমরা কখনো ক্ষমা করব না এবং ভুলব না তা হচ্ছে, পাক আর্মি ও ইনটেলিজেনসের দূষ্কর্মের কথা। আমেরিকানদের মুজাহিদ ও উপজাতীদের প্রতি শত্রুতা প্রমানিত। কারন উপজাতীদের ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিবেশী আফগানিস্তানে আমেরিকানদের হারানো সম্ভব হয়েছে। যাই হোক পাক আর্মির এতটুকু উপলব্ধি হল না যে, তারা নিজেদের মাটি আমেরিকানদের ব্যবহার করতে দিচ্ছে।

১৭ই মার্চ, ২০১১ ডাট্টাখেল টাউন সেন্টারে ৪০ লোকের সমাগম হয়। স্থানীয় মুরব্বী, নেতারা FATA সমস্যা সমাধানের জন্য একত্রিত হন। সরকার নিয়োগকৃত ৩৫ জন উপজাতী নেতারা উপস্থিত ছিল। ৪ জন স্থানীয় তালেবান নেতাও উপস্থিত ছিল। মালিক দৌউত খান এক জন জনপ্রতিনিধি যিনি মিটিং পরিচালনা করেন। শহরের মাঝ অংশে এই ৪০ জন লোক গোল করে ২ টি বৈঠকে পরস্পর হতে ১২ ফুট দূরে মিটিংরত ছিলেন। সকাল আনুমানিক ১০:৪৫ এ একটি বৈঠকের উপর আমেরিকান ড্রোন হতে মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। আহমদ জেন যিনি বৈঠকগুলোর একটিতে ছিলেন, তিনি বলেন, "ঘূর্ণনরত ড্রোন হতে মূহুর্তের মধ্যে মিসাইল ছোড়া হয়। এর ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে দূরে গিয়ে পড়েন। তার বৈঠকের সবাই মারা যান। এরপর আরও কিছু মিসাইল ছোড়া হয় যা দ্বিতীয় বৈঠকেও আঘাত হানে। সর্বমোট ৪২ জনের প্রাণহানি ঘটে। বেচে যাওয়া ইদ্রীস ফরিদ বলেন –"সবকিছু ধ্বংস হয়েছিল। এখানে ওখানে পরে ছিল রক্ত ও টুকরো টুকরো লাশ।

নাম ভিন্ন
উদ্দেশ্য এক

# পরভূমে

আম্মার খান

বসন্তকাল ২০১২। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের দত্তখেলের নিকটবর্তী দোগা গ্রামের একটি শান্ত উষ্ণ বিকাল। মেইনরোড থেকে সেনাবাহিনীর দ্রুতগামী গাড়িগুলোর আওয়াজে নিরবতা ভেঙ্গে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই একটি বেষ্টনী গ্রামটিকে ঘিরে ফেললো। তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল মধ্যখেল ট্রাইব থেকে একজন ওয়াজিরির বাসগৃহ যিনি প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত আছেন বলে জানা গেছে। কেউ জানে না কেন সেনাবাহিনী তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।

স্থানীয় গ্রামবাসীগণ মনে করলো সেনাবাহিনী সীমালঙ্ঘন করছে। তাই সেনাবাহিনী গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার আগেই গ্রামবাসীগণ তাঁদের অস্ত্র তুলে নিল, লক্ষ্য স্থির করলো বেষ্টনীর দুর্বল অংশের উপর এবং তাঁদের কর্তুজ খালি করলো জলপাই রঙের সবুজাভ গাড়িগুলোর দিকে যেগুলো গ্রামটিকে ঘিরে আবর্তন করছিল। আসন্ন বন্দুকযুদ্ধে সেনাবাহিনীর নাইন ডিভিসনকে রক্তস্নাত করানোর পর ওয়াজিরিগণ অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলো। বেষ্টনীর চার্জে থাকা অফিসার আহত অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিল বেষ্টনী প্রত্যাহার করার। সেনারা যখন পশ্চাদপসরণ করছিল, তখন তারা দেখতে পেল একজনবৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর লাঠিতে ভর দিয়ে স্থানীয় মসজিদ থেকে বের হচ্ছে। লোকটি দৃশ্যত আশি বছরের হবে, তিনি সচরাচর শুনতে পান না। যখন তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, যিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে ঘটতে থাকা বন্দুকযুদ্ধের ও আরপিজির শব্দ শুনতে পান নি, পিছু হটতে থাকা সৈন্যরা তাকে তুলে নিল এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে তাদের গাড়ীর পিছনে তুললো। দত্তখেল ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে তাদের ত্বরিত প্রস্থানের সময় সেনা কনভয় দুজন অল্পবয়সী ছেলে দেখতে পেল যারা মেইনরোড অতিক্রম করেছিল। সেনাবাহিনীর জন্য আরো দুটি সহজ লক্ষ্য, যার সামরিক মহিমা আটজন মৃত ও চারজন আহত সৈনিকের কারণে সৃষ্ট ক্ষত মুছে দিচ্ছে। ঐ দুজন ছেলে যাদের একজনের বয়স তের বছর এবং অপরজনের চৌদ্দ, তাদেরকেও ধরা হল এবং ধাক্কা দিয়ে গাড়ীর পিছনে পাঠানো হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে নাইন ডিভিসনের সৈন্যরা রক্তাক্ত অহংকারের সাথে তিনজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এল যাদের কারোই যুদ্ধ করার মত বয়সী নয়। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে বৃদ্ধ লোকটি তাঁর 'অপরাধ' স্বীকার করলো যে, সে ঐ তরুণ লোকের পিতা যে কিনা সেনাবাহিনীর সার্চ অপারেশনের লক্ষ্যবস্তু ছিল। দরিদ্রলোকটি (যে অজ্ঞাত ছিল এই বিদেশী বাহিনীর প্রতিশোধমূলক আচরণের শাসন সম্পর্কে) সে নিজের নিষ্কলুষতা নিয়ে নিজেই নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা স্বাক্ষর করেছে।

পরদিন সকালে, দত্তখেল থেকে দোগাগামী রাস্তার পার্শ্বে স্থানীয়রা তিনজনের দেহ পঁচে যাওয়া অবস্থায় পেল। তিনজনের একজন হল আনুমানিক আশি বছরের দাঁড়িওয়ালা লোকটি, যার চক্ষু উপড়ানো ছিল, তাঁর দেহ ছুরির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ছিল। বাকী দুটি দেহ রাখা ছিল অল্প বয়সের দুটি ছেলের যারা যৌবনের শুরুতে প্রান হারাল। তাঁদের গলিত দেহও বলছিল অত্যাচারের জঘন্যতম পদ্ধতির একটি ভয়ানক গল্পঃ উপড়ে ফেলা চক্ষু, সারা দেহ ছুরিকাঘাতের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করা, এসিডে পোড়ানো। এই অত্যাচারের দৃশ্য ছিল খুবই বেদনাদায়ক, এমনকি অন্যান্য কঠিন হৃদয়ের ওয়াজিরিদের জন্যও কষ্টকর ছিল।

আশ্চর্যের এটি বাকি ছিল সেনাদেরকে কিসে এ ধরনের বিনা বিচারে নৃশংসতায় জড়িত করতে বাধ্য করলো? অবজ্ঞাপূর্ণ দাম্ভিকতা এবং 'রক্তাক্ত বেসামরিক বসতি' মনে বদ্ধমূল করলো PMA কে আলাদা ভাবে, তাঁদের নির্যাতন হচ্ছে একদম স্পষ্ট ভয়ানক যা মেরুদন্ডে শিহরণ জাগানোর মত।

সর্বশেষ আমি ইতিহাস বইয়ে স্পেনের তদন্ত প্রসঙ্গে কিছু নির্যাতনের কথা পড়েছিলাম। ঐ তদন্তকারীরা কি তাদের কবর থেকে উঠে এসেছে, যে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পোষাকের ভেতর দিয়ে এই অত্যাচারের পদ্ধতি প্রস্তাব করে? অথবা এটি কি একটি নোংরা সমার্থক ধারা যা FCR এর সাথে যৌথ নির্যাতন হিসেবে? যদি তাই হয়, ইসরাইলীদের উচিত PMA পরিদর্শন করা এবং প্যালেস্টাইনীদের উপর আরো অধিক কার্যকরী শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য এখান থেকে একটি বা দুটি শৈল্পিক ধারার নির্যাতনের অধ্যায় গ্রহণ করা।

১৯৭১: বাঙালি মুসলিমদেরকে হত্যা

সেনাবাহিনীর পাশবিকতা, বাংলাদেশ থেকে লাল মসজিদ পর্যন্ত, মানুষকে হতবুদ্ধি করে দেয়। কি করে স্পষ্টত সুসভ্য ও সুপরিচ্ছন্ন অফিসার ও সৈন্যরা এত নিম্নস্তরে নামতে পারে? কিন্তু যেটি সর্বাধিক হতবুদ্ধিকর তা হল অযথা বর্বরতা যা এসব পাশবিকতাকেই নির্দেশ করে, তা আরো এবং আরো তীব্র হবে যত আপনি উপজাতীয় কেন্দ্রস্থলে পৌঁছবেন। সৈন্যদের কিছু অংশ সোয়াতে নৃশংসভাবে বয়স্ক লোকদেরকে নির্যাতন করছে, তাঁদের বয়স ৪০, ৫০ ও ৬০ এর ঘরে, তারা একজন দাঁড়িওয়ালা বৃদ্ধকে গলায় দড়ি বেঁধে টানছিল যেখান থেকে তাঁর রক্তের দাগযুক্ত মুখ দেখা যাচ্ছিল, এবং সারকথা হিসেবে মালাকান্দের টিনএজারদের ফাঁসির কথা বলা যায় যা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে আছে, তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটছে, এগুলো পাকিস্তানে ঘাত প্রতিঘাত ও সহিংসতা সৃষ্টি করছে। কিন্তু যা একচোখা মিডিয়ার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে তা আরো বেশি জঘন্য।

লাল মসজিদের নির্লজ্জ বিজেতা

গত বছরের ডিসেম্বরে ইশা চেকপয়েন্টে কিছু সেনার মৃত্যুর প্রতিহিংসাবশত তিরিশ জন ট্রাক ড্রাইভার মীর আলি বাজারে লক্ষ্যবস্তু ছিল এবং পরিশেষে সেনাদের দ্বারা ফাঁসিতে ঝুলতে হয় তাদের। মালাকান্দে তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীলতার অপরাধ দেখিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষদেরকে কয়েকশত ফিট উপরে ভাসতে থাকা হেলিকপ্টার থেকে জীবন্ত ছুড়ে ফেলা হত। ২০০৯ সালে মেহসুদ অপারেশনের সময় যৌথ অপারেশনের আংশিক নীতি হিসেবে সেনাবাহিনী দ্বারা কয়েকশত গ্রাম পুড়িয়ে ফেলা হয়। ২০০৯ সালেই মাকিন থেকে সারারোঘা পর্যন্ত মেহসুদের বাজারগুলো ধ্বংস করা হয় বিমান বাহিনীর বিমান হামলার মাধ্যমে। এমনকি রাহ-এ-আজব অপারেশন শুরু করার পূর্বে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্র, মীর আলি বাজার আর্টিলারী শেলিং দ্বারা ধূলিস্মাত করে দেয়া হয়। বর্তমান অপারেশনের সময় দীগনে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং মুজাহিদীনগণ এলাকা ত্যাগ করার পর সেনাবাহিনীর দ্বারা দীগন বাজারও মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। যা খুব বেশি বিরক্তিকর তা হল যদিও এটি একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, তথাপি এখানে মসজিদগুলো এবং মাদ্রাসাগুলো সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আছে। সেনা অভিযানের সময় সোয়াত, মালাকান্দ, মেহসুদ, বাজাউর, মোহমান্দ, ওরাকজাই, এবং খাইবারে শত শত মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল বিমানবাহিনী।

সোয়াতের রক্তাক্ত বেসামরিক বসতি

একই রকম নির্দোষদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার কূট কৌশল উত্তর ওয়াজিরিস্তানে আবার পুনরায় ঘটছে।

গ্রামগুলো পুড়িয়ে ফেলা, মসজিদগুলো ধ্বংস করা এবং বাজারগুলো ধূলিস্মাত করে দেয়া, গোটা উপজাতীয় বলয়ের ভূপ্রকৃতিকে লন্ডভন্ড করে দেয়া এসবকিছু অভিযোগের সাথে একই প্রশ্ন করছেঃ যারা জন্মলগ্ন থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন ক্ষতি করে নি তাদেরকে কেন এসব (তাদের মধ্যে সন্ত্রাসী অথবা জঙ্গী থাকার অভিযোগ করা) সাব্যস্ত করা হচ্ছে?

হতে পারে এর উত্তর নির্ভর করছে বৃটিশ আমল থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বংশানুক্রমিক মানসিকতার উপর, উপজাতীয় এলাকার উপর এসব আচরণে মনে হচ্ছে যেন এটি ‘এলাকায়ে-গাইর’; পরভূমি। এই উপজাতিদের চিত্র যেমন ‘পর’ এটি আমাদের মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়েছে, এসব একে বাধ্য করে আরো গৌরবময় অতীতে ফিরে যেতে। এর শিকড় চলে যায় বৃটিশ রাজের দিনগুলোতে, যখন তথাকথিত সামরিক ঘোড়-দৌড়বাজ সেনারা রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দিয়েছিল সমতল পাঞ্জাব থেকে যাতে তারা সম্মুখের স্বাধীন অঞ্চলগুলো দখল করতে পারে, যা শতবছর ধরে সেখানে আহবান করছে, যাতে বৃটিশ শাসিত নির্দিষ্ট জেলাগুলোর প্রত্যেক বৃটিশ তাদের অধীন ও অংশ করার চেষ্টা করে। রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মির পাঞ্জাবি সেনারা সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পাঞ্জাব রেজিমেন্টস এর অন্তর্ভুক্ত হল। উত্তরের বাজাউর থেকে দক্ষিণের ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত তারা তাদের বৃটিশ প্রভুদের সাথে নিয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে IPI এর ফকির মোল্লা পাউইন্দাহ এর বাহিনী এবং মুজাহিদীন আন্দোলনের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। পাঞ্জাব ও FF রেজিমেন্ট এর অধিকাংশ যুদ্ধের রং, মেডেল ও সম্মাননা অর্জিত হয়েছিল এসব যুদ্ধের দ্বারা ইংল্যান্ডের রানীর নামে। উপজাতীয় এলাকার উপত্যকা ও
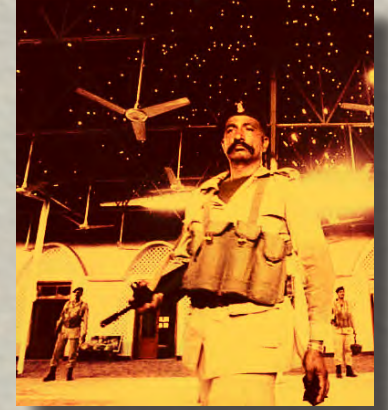
দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোককে মেইন রোডের উপর দিয়ে হেঁচড়ানো

IPI এর ফকির

আমাদের পূর্বপুরুষগণ স্বেচ্ছায় অথবা জোরপূর্বক বৃটিশ রাজের ছায়ায় জীবন যাপন করতে সম্মত হয়েছিল; যেখানে তারা তাদেরকে বৃটিশ রাজত্বের অধীনে আনার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছিল সর্বশেষ বৃটিশ সৈন্য উপমহাদেশ ত্যাগ না করা পর্যন্ত। যখন পাঞ্জাবের এক নিম্ন শ্রেণী অনেক বিস্তৃত ইউনিয়ন জ্যাক, যাকে তারা নিজ ভূমি বলতো, সেখানে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ করে দীর্ঘস্থায়ী গ্লানি ডেকে এনেছিল নিজেদের উপর, তখন উপজাতিগণ ইসলামের প্রতিরক্ষার্থে এবং এক আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করছিল। আমরা যেন ভূলে না যাই, রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মির আত্মস্বীকৃত 'মুসলিম' সেনারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খিলাফত থেকে বের হতেও প্যালেস্টাইন বৃটিশদের দখলে নেয়ার ব্যাপারে জড়িত ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হংকং থেকে নরমান্ডী পর্যন্ত সম্মুখে থেকে মেডেল অর্জন করেছিল, এবং নানা উপায়ে রানীর জন্য তাদের জীবন 'উৎসর্গ' করেছিল।

উপজাতিগণ 'অন্যান্য', কারণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা-পূর্ব ইউনিটগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে বৃটিশ ভারতের সীমানা বৃদ্ধির উচ্চ আশা নিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং 'প্রাদেশিক আজ্ঞা' দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল, তারা এমন এক লোকদের হাতে কেবল পরাজিত হতে হতে ভুগছিল যারা কখনোই শাসক হিসেবে পরিচিত ছিল না। যেখানে মোল্লা পাউইন্দাহ এবং IPI এর ফকিরের মত তাদের সমর নায়কগন, সেখানে 'আমাদের' সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বীরদের উদাহরণ হচ্ছে জেনারেল মুসা খান, যে ওয়াজিরিস্তানে বৃটিশ অভিযানে সামনে থেকে দায়িত্বপালন করেছে, এবং তার নাম, যে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিরানশাহ এর নিকটের পাহাড়বেষ্টিত বয়া চেকপোস্ট ঐদিন সুসজ্জিত করেছে।

তারা 'অন্যান্য' কারণ, পাকিস্তানের অনেকের অপছন্দনীয়, তারা তাদের আত্মাগুলোকে বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং ৯/১১ এর পর বলেছে 'আমেরিকা প্রথমে', এবং তের বছরের বেশি সময় ধরে অবিচলিতভাবে আমেরিকা, ন্যাটো এবং তাদের স্থানীয় আত্মস্বীকৃত পোষা কুকুর, যেমন পাকিস্তান সেনাবাহিনী, আইএসআই, এমআই, বিমান বাহিনী ইত্যাদি, এদের গলার কাঁটা হয়ে আছে। এরা তারাই যারা ন্যাটো কন্টেইনার তাদের দেশের উপর দিয়ে পরিবহনে রাজি হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যেখানে আমাদের সেরা কিছু ব্যক্তিমুখেই

পাহাড়গুলোতে শত শত দমন অভিযান ও কঠিন যুদ্ধ সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার ও রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মি শান্তিপূর্ণ উপজাতিদেরকে মুক্তি ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি। তাই তারা পরিণত হল 'অন্যান্য' হিসেবে।

তারা আমাদের সবার মনে 'অন্যান্য' হয়েই রইল কারণ আমাদের পূর্বপুরুষগণ কেউ স্বেচ্ছায় অথবা কেউ জোরপূর্বক বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যা ঐ উপজাতীয়রা করে নি।

মেহসুদ অপারেশন, ২০০৯

উপজাতীয় অঞ্চল "মুক্ত করণ": বাজাউরে সেনাবাহিনী

মেহসুদে সেনাবাহিনীর দ্বারা বাজার ধ্বংস ।

প্রতিবাদ করতে পারে। তারা 'অন্যান্য' কারণ তারা অগণিত ড্রোন হামলা, অসংখ্য সেনা অভিযান, আমেরিকা ও ন্যাটোর হুমকি এসব সত্ত্বেও মুজাহিদীনগণকে এক দশকের অধিক সময় ধরে আপ্যায়ন করেছে, যেখানে পাকিস্তান এর স্থল ও আকাশসীমাকে ক্রুসেডারদের জন্য ফ্রি-জোন হিসেবে পরিণত করেছে।

কিন্তু এটিই কি সত্য যা আমরা অবচেতনভাবে গ্রহণ করছি? আমি সন্দিহান। পাকিস্তানে একজন ব্যক্তি বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে যা শুনতে পায় তা বিভিন্ন কাহিনী। অপরাধের আখড়া, ডাকাত, খুনী, প্রতারক, চোর, গাড়ী ছিনতাইকারীদের নিরাপদ স্বর্গ, উপজাতিগণের ব্যাপারে এসব নিগূঢ় তথ্য এবং আরো আছে...। কিন্তু, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন। কেউ কি আছেন যিনি সাধারণ এলাকার সাথে উপজাতীয় এলাকার অপরাধের মাত্রা, যেমন... চুরি, খুন, মুক্তিপণের জন্য অপহরণ এবং গাড়ী ছিনতাই... এসব অপরাধের পরিসংখ্যানের তুলনামূলক চিত্র নিয়ে কখনো মাথা ঘামান? গাড়ী ছিনতাই, চুরি, খুন এবং মুক্তিপণের জন্য অপহরণ এসব অপরাধের আখড়া হিসেবে আমাদের মেগা সিটিগুলো দেখিঃ লাহোর, করাচি, পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিন্ডি। সার্বজনীন ধারণার বিপরীতে, পাকিস্তান থেকে বেশির ভাগ ছিনতাই হওয়া গাড়ী উপজাতীয় এলাকায় গিয়ে পাওয়া যায় নি, বরং এগুলোকে সাধারণ এলাকাগুলোর পাশেই পাওয়া গেছে, বিশেষত সোয়াবি, নওশেরা এবং কোয়াত, এবং তাদের স্পেয়ার পার্টসগুলো বড় শহরগুলোর স্পেয়ারপার্টস এর দোকানে বিক্রয় করা হয়েছে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং আমার মত শত শত অন্যান্যদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি দৃঢ়তার সাথে এ দাবি করতে পারি যে, উপজাতীয় এলাকাগুলো সাধারণত এবং বিশেষ করে ওয়াজিরিস্তান পাকিস্তানের সর্বনিম্ন অপরাধ প্রবণ এলাকা। কেন? কারণ আপনারা এখানে পাঞ্জাবের পুলিশদেরকে পাবেন না। এখানে কোন অপরাধ সংঘটিত হয় না, কারণ উপজাতীয় বলয়ে কোন পুলিশ স্টেশন নেই। আপনি শান্তিপূর্ণ একটি জায়গায় একটি পুলিশ স্টেশন স্থাপন করুন, আপনি শীঘ্রই দেখবেন অপরাধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করছে। পুলিশ সেখানেই সাফল্য লাভ করে যেখানে অপরাধও সাফল্য লাভ করে। অপরাধ তাদের পকেট সবদিক থেকে টাকায় পূর্ণ করে দেয়। শূন্য মাত্রার অপরাধ যে সমাজে বিদ্যমান সেখানে পুলিশের প্রয়োজন নেই। আরেকভাবে বলা যায়, পুলিশের ঐ সমাজকে প্রয়োজন নেই যেখানে অপরাধের মাত্রা শূন্য। এটি তাদের টিকে থাকার প্রশ্ন।

আপনি সেখানে অপরাধ পাবেন না তার আরেকটি কারণ এটি একটি সশস্ত্র সমাজ। আসলে এটি সশস্ত্র হওয়ার আগে এটি একটি 'সমাজ'। এটি আমাদের শহরগুলো থেকে পৃথক একটি পৃথিবী যেখানে আমাদের শহরগুলোতে সকল সামাজিকতা দুভাগ করা হয়েছে টাকার মিথ্যা প্রভু ও জড়বাদ দ্বারা। আমাদের শহরগুলো দখল করেছে অকর্মণ্যরা যারা তাদেরকে প্রকৃত জগত থেকে রক্ষা করতে চারদিকে নিজস্ব নকল বাস্তবতা সৃষ্টি করে। এটি একটি নকল জগত যেখানে আপনি চলন্ত এটিএম থেকে আগত একজন মানুষের সাথে কথা বলতে পারবেন না। আর বিষয়গুলোকে জঘন্য করতে দুইধরনের অপরাধীদের অস্ত্রের উপর একচেটিয়া অধিকারঃ এক হচ্ছে ইউনিফর্ম পড়া যারা নীল নকশার রাষ্ট্রনীতির চতুর্দিকে ঘুরে, (যদি সে একজন বড় ধরনের অপরাধী হয়, তারপরও একজন জলপাই সবুজাভ হিলাক্স) এবং অপর অস্ত্রধারীরা হচ্ছে ক্ষুদ্র চোরও ডাকাত, যাদের অধিকাংশ সময়ই ম্যাগাজিনে বুলেট থাকে না এবং তারা দুইবার তাদের বন্দুক লোড করবে, যদি তিনবার না করে, তাহলে বুঝতে হবে তাদের নির্দোষ (পড়ুন অজ্ঞ) শিকারকে ভয় দেখাতে এরকম করছে।

উপজাতিদের মধ্যে বাজাউর থেকে ওয়ানা পর্যন্ত এলাকার মানুষজন সবচেয়ে ধন্য মানুষ শুধু এই দেশেরই নয় বরং সারা পৃথিবীর মধ্যেই। তারা আমার জীবনে দেখা সর্বাধিক জনসেবী মানুষ, পাশাপাশি তারা সৎ, নির্ভেজাল এবং সাহসী। তারা আমাদের শহুরে সংস্কৃতির মত নয়, তারা একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অতিথিকে অধিক আপ্যায়নের ক্ষেত্রে, এমনকি অতিথিকে সমাদর করতে সৌজন্যমূলক যুদ্ধ করে, যেখানে আমরা সৌজন্যতার অভাববশত প্রায়ই পরোক্ষভাবে অতিথিকে প্রশ্ন করিঃ আপনিকি এখানে আসার আগে খেয়ে এসেছিলেন নাকি আপনি এখান থেকে যাওয়ার পর খাবেন।

তারা এমন এক সম্মানিত ও গর্বিত মানুষ, যারা ইসলামকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন করতে দ্বিধা করে না। এখানে উপজাতীয় সমাজের ব্যাপারে একটি অন্তর্নিহিত ভালো দিক আছে যেখানে সর্বত্রই উপজাতি ও উপজাতীয়

সমাজ বৈশ্বিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ইসলামের উপর নির্ভর করেছে এবং তারা মুজাহিদীনগণকে আশ্রয় দিয়েছেন। এটি একটি অতি মানবীয় বিষয় যা আমরা মালি, সোমালিয়া, ইয়েমেন থেকে আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকায় পুনর্বার ঘটতে দেখছি। বিস্ময়ের কিছু নেই, এই কৃত্রিম জীবনের যেসব চিহ্ন আমরা আমাদের শহরগুলোতে ক্যান্সারের মত বেড়ে যেতে দেখি সেই আমেরিকার বৃহত্তম মিশ্র সংস্কৃতির প্রবক্তারা দেখছে করাচি, ইসলামাবাদ, লাহোর, রিয়াদ অথবা কায়রো থেকে হুমকি আসছে না, বরং তা আসছে ওয়াজিরিস্তান, আবিয়ান, মালি, এবং সোমালিয়ার উপজাতীয় পশ্চাভূমি থেকে। এটি ঐসব মুসলিম দেশসমূহের উপজাতীয় অঞ্চল যেগুলো নব্য-ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর ও তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রধান লক্ষ্য। এমনকি যেমন আমাদের সমাজ এ যুদ্ধে অনীহা ও সংশয় দ্বারা প্লেগাক্রান্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের শত্রুরা 'অন্যান্য' দেরকে চিহ্নিত করতে ভূল করে নি যা এর জন্য হুমকি। আমাদের শত্রুরা শত্রু থেকে বন্ধু প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় নি। এটি জানে মুসলিম সমাজের মধ্যে ঠিক কোথা থেকে এর বৃহৎ পরিকল্পনার হুমকি আসে এবং এটি খুঁজে বের করছে এটি যেমন 'গৃহ ভৃত্য' শ্রেণী থেকে বিশ্বাসযোগ্য মিত্র, যা অব্যর্থভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বৃহৎ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে।

কাজেই, যতক্ষণ না আমরা সঠিক 'অন্যান্য' দেরকে চিহ্নিত করতে না পারবো যা আমাদের মধ্যেই অবস্থান করছে, যা প্রতিরক্ষামূলক আবাসন সমাজ নির্মাণ করে উন্নতি করছে আমাদেরই ট্যাক্সের মাধ্যমে, যা এর নিজ লোক ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে চিনে না, যার একটি নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য রয়েছে নিজের লোকদেরকে শিকার করার যারা একে ৬০ বছর ধরে অকাতরে বাঁচিয়ে রাখছে, এবং আমরা যতদিন না এর শত্রুদের মুখোশ পড়ে আমাদের সাথে প্রতারণার ও ভন্ডামির ভান উন্মোচন করছি, ততদিন আমরা আমাদের নিজেদের লোকদেরকে খুন হতে দেখব এবং তাদের শহর ও গ্রামগুলো কমতে কমতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এখনই সময় আমাদেরকেও সাহস সঞ্চয় করতে হবে শত্রু থেকে বন্ধু প্রমাণ করার জন্য। ▯
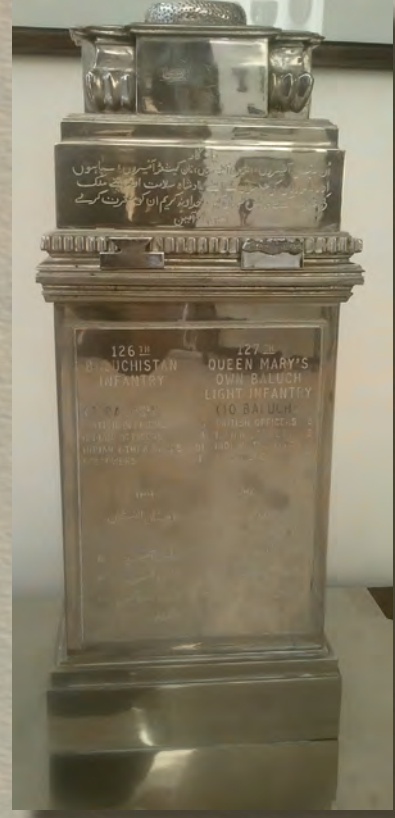
**ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ৭ ও ১০ বালুচ রেজিমেন্টেকে প্রদানকৃত ট্রফি।**

যাতে লাঞ্ছনাকর বাক্য লিখা:
"ঐ সকল ব্রিটিশ অফিসার, এনিসিও, সৈনিক ও তাদের অনুসারীদের স্মরণে যারা রাজা ও দেশের জন্য তাদের জীবন ত্যাগ করেছে।"

## গণতন্ত্রের নতুন মুখ

# ভারতে মুসলমানদের ভবিষ্যত

**মাওলানা আসিম ওমর (হাফিজাহুল্লাহ)**
উপমহাদেশের আল কায়েদার আমির

রতের শাহারানপুরের মুসলমানেরা আবারো একটি গোলাম জাতির পরিণতি ভোগ করলো তার খেয়ালীপূর্ণ প্রভুর দয়ায়।

এই পৃথিবীর দুর্বলদের কাছে ন্যায়বিচার, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকার এই শব্দগুলো অর্থহীন। এই সকল কল্পনাপ্রসূত শব্দসমূহকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার বা এসব অধিকার কারা পাবে আর কারা নয় তা নির্ধারণ করার একচ্ছত্র অধিকার রাখে পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিগুলো।

অদ্য জুলাই মাসে শাহারানপুরে নির্মমভাবে মুসলমান হত্যা, মুজাফফরনগর এবং আসামে মুসলিম গণহত্যা এসব কোন বিচ্ছিন্ন নির্যাতনের ঘটনা নয় যেখানে প্রতিবারই দূর্ঘটনাবশত মুসলিমরা নির্মমতার শিকার হয়।

## মুজাফফর নগর
# গণহত্যা

মূলত এগুলো হচ্ছে তথাকথিত সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নোংরামির ফলে সংগঠিত ইচ্ছাকৃত গণহত্যা।

৬৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান অসংখ্য মুসলমান গণহত্যা সত্ত্বেও যারা আজও দাবি করে যে, ভারতের মুসলমানরা স্বাধীন বা তারা সেখানে সমান অধিকার ভোগ করে অথবা তাদের জান-মাল সংকটাপন্ন নয় তবে হয় তারা অতিশয় নির্বোধ আর না হয় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করছে।

৬ দশকেরও অধিক সময়ের হিন্দু শাসনের অধীনে সংঘটিত অগণিত হত্যাযজ্ঞ সত্ত্বেও যারা জোর গলায় বলেন যে, ভারতের মুসলমানরা সমান অধিকার ভোগ করেন বা তাদের জান-মাল সুরক্ষিত তারা মূলত সেই সম্প্রদায়ের উন্মত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার পর থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অফিসিয়ালভাবে পরিচালিত মুসলিম নেতা তৈরির জন্য ভারত কঠোর শ্রম দিয়েছে যারা কিনা তোতা পাখির মত মিডিয়ায় প্রচারিত এসব দাবি মেনে নিতে সর্বদা নিজেদের দায়িত্ব মনে করবে। যদিও ভারতীয় সাধারণ জনগণের কাছে এই সকল দাবি সস্তা টিভি বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশি সত্য নয়।

বিহারের বাহাওয়ালপুর দাঙ্গা, উত্তর প্রদেশের মীরাট ও মুরাদাবাদ দাঙ্গা, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পরে নির্মমভাবে জবাই করে মুসলিম হত্যা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মুসলিম হত্যা, মুজাফফরনগরের গণহত্যা বা শাহারানপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমান মেয়েদের সতীত্বহানি করা হয়।

সেই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহ এটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কিভাবে

> কোন গোলাম জাতির শুধুমাত্র তাদের কর্তা প্রদত্ত 'অধিকার', 'স্বাধীনতা' ও 'ন্যায়বিচার' নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প নেই।

ইসলামপূর্ব ভারতে উচ্চ জাতের হিন্দুরা নিম্ন জাতের দলিতদের মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে বা বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে সম্মানহানি করত। মূলত, উচ্চ জাতের হিন্দুরা এই কুপ্রথাকে তাদের পবিত্র অধিকার মনে করত।

এমনকি আজও ভারতের ঐতিহাসিক ও স্বঘোষিত মানবাধিকার কর্মীদেরও এই বর্বরতার ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এটা এ কারণে যে, তারা একে উচ্চ জাতের হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকার মনে করে। তারা মনে করে কোন গোলাম জাতির শুধুমাত্র তাদের কর্তা প্রদত্ত 'অধিকার', 'স্বাধীনতা' ও 'ন্যায়বিচার' নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প নেই।

আর সেই একই ঘটনাই আজকের আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে মুসলমানদের সাথে ঘটছে। তাহলে ভারতের মুসলমানদের উপর এই নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতনের জন্য কাকে দায়ী করা হবে? গোত্রীয় আন্দোলনসমূহকে? বিজেপি নাকি আরএসএস কে? উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারকে নাকি কেন্দ্রীয় সরকারকে?

আপনি যদি প্রতারক ভারতীয় মিডিয়ার মাধ্যমে এই ঘটনাপ্রবাহ জানতে চান, তবে আপনি বিভ্রান্তি ও মিথ্যার গোলকধাঁধায় পড়বেন। ভারতের বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের নিকট প্রত্যক্ষ কোন খবরের উৎস না থাকায় তাদের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের কষ্ট-দুর্দশা বোঝা প্রায় অসম্ভব। একজন বাইরে থাকা দর্শকের কাছে অনেক মৌলিক প্রশ্নেরই উত্তর জানা থাকে না। তারা জানেনা ভারতীয় মুসলমানেরা কি সত্যিই মুক্ত-স্বাধীন? তারা কি হিন্দুদের মত সমান অধিকার ভোগ করে? তারাও কি ভারতের সম্মানিত নাগরিক? তাদের অবস্থা কি সেই সকল দলিতদের চেয়ে কোন রকমে ভিন্ন যাদের স্পর্শও করা যায়না ও যারা সমাজের নিম্ন জাত?

আসল কথা হল বাইরে থাকা কোন দর্শক ভারতের মুসলমানদের এই দুর্দশা বুঝতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা সেটা বোঝার চেষ্টা করে এমন প্রতারক মিডিয়ার চোখ দিয়ে যাদের প্রতারণার জাল ভেদ করা খুবই কষ্টকর যদিনা আগে থেকেই হিন্দুদের মনমানসিকতা জানা না থাকে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পরও কি আপনি আবারো তথাকথিত মুসলিম নেতাদের দ্বারা সত্য বোঝার চেষ্টা করবেন? ক্ষমা করবেন, আপনি যদি এমনটি করেন তবে তা শুধু আপনার মূল্যবান সময়ই নষ্ট করবেনা বরং আপনাকে নিশ্চিতভাবেই পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে ছাড়বে। আর এটা এ কারণে যে, দূর্ভাগ্যবশত শুধুমাত্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই ব্রাহ্মণদের হাতে নয় বরং রাষ্ট্র ক্ষমতার অন্যান্য সকল উপাদানই তাদের করায়ত্বে। আর এসবগুলোই ভারতীয় মুসলমান ও বিশ্বের অন্যান্যদের এটা বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ভারত খাঁটি গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে মুসলমান সম্প্রদায়সহ সকল নাগরিকেরাই পূর্ণ স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ভোগ করে আর কোন মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ও গণহত্যা হল মাত্র গুটিকয়েক গোত্রীয় সম্প্রদায় কর্তৃক সংঘটিত অপকর্ম।

আর এসব ফাঁকা দাবি মানুষের কাছে প্রমাণিত করার ব্যর্থ চেষ্টা স্বরূপ কিছু রাজনৈতিক দল মুসলমানদের রক্ষাকর্তারূপে সামনে এগিয়ে আসে। এমনও দেখা যায় যে, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট হঠাৎ করে কিছু অপরাধীদের হালকা শাস্তি প্রদান করে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ভারত সত্যিই একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র যেখানে আইনের শাসনকে শ্রদ্ধা করা হয়। আর যদি এসব কিছুই ব্যর্থ হয় তখন বলিউড এমন একটি চলচিত্র নির্মাণ করে নিয়ে আসে যেখানে এটা প্রমাণ করা হয়- যদিওবা মুসলমানরাই আসল অপরাধী, তবুও ভারত সরকার তার অশেষ কৃপায় তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করেছে ও অপরাধীদের যোগ্য শাস্তি প্রদান করেছে।

আপনি হয়ত শুনে অবাক হবেন যে, মুসলিম নেতাদের মধ্যে অফিসিয়াল একাংশ রয়েছে যারা এসব চলচিত্রে উপস্থাপিত কাহিনীকে সত্য মনে করে এবং ভারতের শান্তিকামিতা ও ন্যায়বিচারের প্রশংসা করে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এসব নেতারা প্রায়ই সৌদি আরব ও পাকিস্থান সফর করে এটা প্রচার করেন যে- ভারতের মুসলমানরা কেবল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই ভোগ করছেন না বরং কেউই তাদের প্রতি কোন রকমের অবিচার করতে পারবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

নারকীয় এই নাটকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এই সকল তথাকথিত মুসলিম নেতারা যারা লোকসভা কিংবা রাজ্যসভার একটি আসনের বিনিময়ে

অনেক বছর যাবৎ মুসলিমদেরকে ভারতীয় গণতন্ত্র, সেক্যুলার রাষ্ট্র, গান্ধীর ভূমি ইত্যাদি ফাঁকা বুলির মাধ্যমে বোকা বানিয়েছে...

মুসলমানদের বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করেনা। প্রত্যেক যুগেই ভারতীয় হর্তাকর্তারা এসব নেতাদের যারা কিনা এসব হিন্দুদের কুৎসিত চেহারাগুলোকে ঢাকতে চেষ্টা করে তাদের সামনে রেখে সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্রের মুখোশে কাজ করে।

বাস্তবতা হল, আজ পর্যন্ত ভারতের মুসলমানদের সাথে যা যা ঘটেছে, তা না কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির নিজস্ব পাতানো কোন ষড়যন্ত্র আর না কোন ভোটের রাজনীতির দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য কারণ অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সমর্থন আদায়ের জন্য করা হয়। আসলে এ সকল ঘটনার পেছনে ভারতীয় সংস্থার শক্ত হাত কাজ করছে এই লক্ষ্যে যেন এক সময়কার রাজা বাদশার আসনে অধিষ্ঠিত মুসলমানদের শূদ্র, দলিত ও নিম্ন জাতের অবস্থানে নিয়ে আসা যায়। আর মুসলমানরা যাতে হিন্দুদের প্রতিরোধের মনোবল ও শক্তি হারিয়ে ফেলে সেজন্যও তারা পদ্ধতিগতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গত কয়েকমাস আগে মুজাফফরনগরে পরিকল্পিত গণহত্যার অংশ হিসেবে শতশত মুসলমানদের গণহত্যা করা হয়, মুসলমান নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়, শিশুদের জীবন্ত পোড়ানো হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও সহায় সম্পত্তিতে আগুন দিয়ে ছারখার করে তাদের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। শামিলী আজ মুসলমানদের শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে যে শামিলীর প্রান্তরে ১৮৫৭ সালের জিহাদে ন্যায়পরায়ণ মোজাহিদদের কাছে বৃটিশবাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। শামিলীর ৪০ কিঃ মিঃ অদূরেই ঐতিহাসিক পানিপথ অবস্থিত যা ছিল মুসলমান বিজেতাদের জন্য দিল্লীর প্রবেশপথ। আর আজ মুসলমানদের সেই গৌরবময় বীরত্বগাঁথার চিহ্নই মুসলমানরা ভুলে গেছে (হিন্দুরা কিন্তু ভুলেনি)। সেদিনের সেই আফগান ও মধ্য এশিয়ায় মুসলমান বিজেতাদের সেনাবাহিনী বিশাল হিন্দু সেনাবাহিনীকে হঁটিয়ে অতি সহজেই বিজয় লাভ করত।

এটা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, যারা একসময় শত শত বছর এই ভারত শাসন করেছে তাদেরকেই আজ তাদের নিজেদের বাড়ি-ঘর থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়েছে। আর আজ তাদের ইচ্ছার কোন দাম নেই এবং তারা জীবনযাপন করছে শরণার্থী শিবিরে। আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কারণে ঘোষণা করা হয় যে, শীঘ্রই শরণার্থীদেরকে তাদের নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরিয়ে দেয়া হবে! তারা কোথায় ফিরবে? হিন্দু রাষ্ট্র ভারত তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে তাদের স্থলে সেখানে হিন্দুদের স্থান দিতে।

*শামিলী আজ মুসলমানদের শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে যে শামিলীর প্রান্তরে ১৮৫৭ সালের জিহাদে ন্যায়পরায়ণ মোজাহিদদের কাছে বৃটিশবাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।*

ভারতের মুসলমানরা এই প্রতারণা ও ধোঁকা সহ্য করতে পারেনা। অনেক বছর যাবৎ মুসলিমদেরকে ভারতীয় গণতন্ত্র, সেক্যুলার রাষ্ট্র, গান্ধীর ভূমি ইত্যাদি ফাঁকা বুলির মাধ্যমে বোকা বানিয়েছে। হিন্দুদের দ্বারা যে সকল মুসলমানদের জ্বালিয়ে ছারখার করা হয়েছে তাদের অন্তরের গভীরে প্রোথিত ঘৃণা এসব ফাঁকা স্লোগানে আর প্রতারিত হবেনা।

নিষ্পাপ শিশুদের কীটের মত জলন্ত আগুনে এমনভাবে নিক্ষেপ করা হয় যেন তারা মানুষের বাচ্চা না। মুসলমান যুবকরা কিভাবে মুহাম্মদে আরাবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক বোনদের হৃদয়বিদারক কান্নার আওয়াজ কিভাবে ভুলতে পারে? না, তারা তা কখনই ভুলবেনা। মুহাম্মদ বিন কাসিম, মাহমুদ গজনবী, আওরঙ্গজেব ও শহীদ টিপু সুলতানের আধ্যাত্মিক পুত্ররা কিভাবে এই অপমান কখনও ভুলতে পারে যা কিনা এই হিন্দু রাষ্ট্র তাদের অন্তরে খোঁদাই করে দিয়েছে? মোজাফফরনগর ও শাহারানপুরের ঘটনা কিভাবে মুসলমান যুবকরা ভুলতে পারে যা তাদের অন্তরে শক্ত দাগ কেটেছে? না, আর কখনোই ভারতীয় মুসলমানরা তাদের এসব ফাঁকা স্লোগানে প্রলুব্ধ হবে না। কোন দল, অফিসিয়াল মুসলিম নেতা, পার্লামেন্ট বা সুপ্রিম কোর্ট কেউই তাদের দুর্দশা মোচন করতে পারবে না।

দীর্ঘ ৬৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে তারা চরম দুর্দশায় জীবনযাপন করছে, আর মুসলমানদের এই দুর্দশা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব হিন্দুদের মধ্যে সামান্য ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু মূলত তারা এক ও অভিন্ন; মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু, আমাদের ধর্মের শত্রু, প্রিয় রাসুল (সাঃ) এর শত্রু। তারাই আমাদের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার প্রকৃত শত্রু। এটা কখনোই ভুলে গেলে চলবে না যে, দুর্বলদের নির্যাতন করা ও নিপীড়িতদের পদদলিত করা হিন্দুদের মন-মগজে প্রোথিত রয়েছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে, হিন্দুরা হল ক্ষমতার পূজারী। সে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী যে কাউকেই তার প্রভূ বলে মেনে নেয়। কিন্তু কোন হিন্দু সমাজে দুর্বলদের জন্য নীতি, নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য বা মমতার কোন স্থান নেই।

প্রিয় ভারতীয় মুসলমান ভাই-বোনেরা! আপনারা এসব ভন্ডদের ঘৃণ্য প্রতারণায় প্রতারিত হবেন না। আপনারাই তো হাজার বছর ধরে ভারত শাসন করেছেন। আপনাদের সময়ে ভারত ছিল সোনার পাখি। এই মুসলমানেরাই ভারতকে গৌরবান্বিত করেছিল।

সময় এসেছে আমাদের নিজেদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করার। এই অপমানকর জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে হলে এতদিন ধরে আমরা যে ব্যর্থ পথ পরীক্ষা করছিলাম সেটা পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত কম নিষ্পিষ্ট পথ অবলম্বন করতে হবে। আমাদেরকে এমন এক পথ বেঁছে নিতে হবে যে পথ নিশ্চয়তা দেয় এক সম্মানিত জীবনের ও মর্যাদাবান মৃত্যুর। এমন একটি দিনের জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করতে হবে যেদিন আমাদের কাউকেই বেদনার নিঃশ্বাস ফেলতে বাধ্য হতে হবে না বা জীবন ভিক্ষা চাইতে হবে না। আমাদেরকে এমন একটি জীবন গ্রহণ করতে হবে, যে জীবনে মৃত্যুই জীবনকে সুরক্ষা দেয়।

প্রিয় ভারতীয় মুসলমান ভাই-বোনেরা! আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) এর শত্রুর সামনে ঝরানো হাজারো অশ্রু আপনাদের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না।

কেউই আপনাদেরকে আপনাদের অধিকার দিবে না যতক্ষণ না আপনারা জানবেন যে, নিজেদের সম্মান, ও অধিকার নিশ্চিত করতে কিভাবে শক্তির ব্যবহার করতে হয়। আপনারা যদি আজ নিজেদের সম্মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চান ও নিজেদের ঐতিহাসিক গৌরবময় দিনগুলিতে ফিরে যেতে চান, নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হিসেবে না থেকে বিজয়ীর বেশে পানিপথ প্রান্তরে ফিরে যেতে চান, তবে মুক্ত-স্বাধীন ভূমি আফগানিস্থানে আসুন। জিহাদ সম্পর্কে জানুন এবং ভারতের মুসলমানদের এই সম্মানিত ও বিজয়ের পথে ফিরিয়ে আনুন। এই জিহাদের পথই নিকট অতীতে উদ্ধত এক পরাশক্তিকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে আর আজ অপর পরাশক্তি একই পরিণতির দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে।

আফগানিস্থানে শহীদদের পথ ইসলামী খিলাফার পথ। এ পথ হল আল্লাহর দ্বীনের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার পথ। এ পথ হল যারা আল্লাহকে ভালবাসে আল্লাহর জমিনে তাদেরকে আল্লাহর সত্যিকারের প্রতিনিধি বানানোর পথ। এ পথ হলো সবলদের অত্যাচার থেকে দুর্বলদের রক্ষা করার পথ। এ পথই আপনাকে দুনিয়ার সংকীর্ণ গিরিখাত থেকে উদ্ধার করে আখেরাতের অনন্ত বিস্তৃতিতে নিয়ে যেতে পারে। দশকের পর দশক পরাধীনতার অভিজ্ঞতা সারা বিশ্বের মুসলমানদের এই অনুভূতি দান করেছে যে- তাদের সম্মান ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ হচ্ছে সেই পথ, যে পথে চলার মাধ্যমে আমাদের পূর্ব প্রজন্ম মর্যাদার উচ্চ আসনে আরোহন করেছিলেন। আর এটাই হল কোরআনের পথ; সাহাবা (রাঃ) কর্তৃক অনুসৃত নবী প্রদর্শিত পথ।

এ ব্যাপারে আমাদের খুব অল্পই সংশয় আছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মুসলমানরাও একথা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, তাদের ভবিষ্যত আফগান জিহাদের সফলতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক পন্ডিতেরা এ সত্য খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে।

তারা জানে যে, আফগানিস্থানে তালেবানদের বিজয় ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু আধিপত্যের জন্য সমূহ বিপদের কারণ হবে। আর তাই ভারত সরকার মুসলমানদেরকে এই আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সে ভয় করে যে, যদি এ আন্দোলনের ছিটেফোঁটাও তাদের দেশের মুসলমানদের কাছে পৌঁছে তবে তাদের ভূমির ইতিহাসে রক্ষিত মুসলমানদের সুপ্ত অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

হাদিসের বর্ণনা ও সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকালেই ভারতের মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা কিনা আফগানিস্থানে ইসলামিক আমিরাত প্রতিষ্ঠার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই ভারতের মুসলমানদের জন্য সময় এসেছে আফগান জিহাদে একটি অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখার ও এ ভূমির দীর্ঘ ৪০ বছরের জিহাদী অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা নিয়ে অনাগত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত রচনা করার। □

**আপনারা যদি আজ নিজেদের সম্মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চান ও নিজেদের ঐতিহাসিক গৌরবময় দিনগুলিতে ফিরে যেতে চান, নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হিসেবে না থেকে বিজয়ীর বেশে পানিপথ প্রান্তরে ফিরে যেতে চান, তবে মুক্ত-স্বাধীন ভূমি আফগানিস্থানে আসুন।**

শূণ্য থেকে টাকা তৈরী করতে চান?

একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করুন!

এই বিজ্ঞাপনের সৌজন্যে এলান গ্রীনস্পেন (সাবেক চেয়ারম্যান, এফইডি)

# বাংলাদেশ পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে

■ সুলায়মান আহমদ

যখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সেকুলারিজম গিলে খাওয়ানোর অন্যায় চেষ্টা চালানো হয় তখন 'শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-সমাবেশ' এবং 'গণতান্ত্রিক পরিবর্তন' এর কথা ভুলে গিয়ে নতুন কিছু ভাবতে হয়। যখন দুই হাজারেরও বেশী মানুষকে এই দেশে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এমন একটি দাবি জানানোর 'অপরাধে' যা কি না মুসলিম বিশ্বের অন্য যেকোন জায়গায় এমনিতেই গ্রহণযোগ্য, তখন অবশ্যই বৃথা হা-হুতাশ জানানো যথেষ্ট থাকে না। যখন আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) (তাঁর জন্য আমাদের জান কুরবান হোক) কে এই জমিনের কিছু নর্দমার কীট ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করে তখন শুধু মৌখিকভাবে নিন্দা জানালে চলবে না। .

আমরা, বাংলাদেশের মুসলিমদের এই প্রশ্নগুলো নিজেদের করতে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়ঃ আমরা কি আমাদের দেশটাকে আতাতুরকের মস্তিস্কপ্রসুত সেকুলারিজমের প্রতিলিপি হিসেবে দেখতে চাই? ব্রিটিশ দাসত্বের সেই অন্ধকার দিনগুলো-যখন একজনকে দাঁড়ি রাখা বা মুসলিম নাম ধারণ করার জন্য ট্যাক্স দিতে হত, আমরা কি সেই স্মৃতি আবার ফিরিয়ে আনব? এদেশের কিছু কুলাঙ্গার নাস্তিক যারা 'শাহবাগ আন্দোলনের' মত প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে অথচ সাধারণ মুসলিম যারা ইসলামের মৌলিক অধিকারগুলোর দাবি জানাবে তারা মতিঝিলে নির্মম গণহত্যার শিকার হবে, আমরা কি এটা মেনে নেব? এ সবকিছু বাস্তবায়ন হয়ে যাবে আর আমরা কি নীরবে মার খেয়ে যাব? 'জাতীয় চেতনার' অযাচিত ব্যাবহার আমাদের ইসলামী পরিচয়কে ধূলিসাৎ করে দিবে, এটা কি আমরা মেনে নেব? 'প্রতিশোধ পরায়নতার' বীজ সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে এ জাতির জনমনে বপন করে একটি গোষ্ঠীকে দৈত্যে পরিনত করা হয়েছে যাতে আমরা তাদের ঘৃণা করি, আমরা কি এটা মেনে নেব? আমরা কি এটা মেনে নিতে পারি যে, 'একাত্তরের চেতনা' একটি দাবানলে পরিনত হবে আর তা গোটা জাতিকে গ্রাস করবে? "যে জাতির নেতা একজন মহিলা তারা উন্নতি করতে পারে না" (বুখারিঃ৪৪২৫)-প্রিয় নবী (সাঃ) এর এই হাদিসটি কি আমরা ভুলে গেছি? অবশ্যই আমরা উন্নতি করব না যখন হাসিনা ওয়াজেদের মত একজন বিবেক বর্জিত মহিলা এ জাতিকে নেতৃত্ব দিবে! 'যুদ্ধপরাধের' সাজানো নাটক বা এ বিষয়ে কোন একটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কিংবা অন্য কোন দলের জুলুমের পক্ষে অবস্থান নেয়া, এর কোনটাই বর্তমানে বাংলাদেশের ইস্যু নয়। ১৯৭১ সালে যারা জুলুমের শিকার হয়েছিল তাদের ন্যায়বিচার দেয়াও উদ্দেশ্য নয়। এগুলো তাদের মুখের কথা...... এমনকি এদেশের সেকুলারিজমের অন্ধভক্ত গোষ্ঠী গত দেড় বছর ধরে সংঘটিত তাদের নির্দয় আচরণ থেকেও নিজেদের মুক্ত মনে করে। ক্ষমতা দখল করে থাকা এই ক্ষুদ্র দলটির কাজকর্ম সবদিক থেকে নীতি বর্জিত যা সকলের কাছেই স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের মদদপুষ্ট বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ইসলামের ভুমি থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দেয়ার পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

ইসলামের প্রতি তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা ঘৃণা অবশেষে সবার সামনে প্রকাশ পেয়েছে। তারা যে একটি মুসলিম সমাজে জন্ম নিয়েছে, এই সেকুলার গোষ্ঠী যেন সেটাই অস্বীকার করতে চায় এবং সম্ভবত তারা তাদের চামড়ার রংকেও ঘৃণা করে। তাদের প্রভুদের অনুকরণে তারা অনেকটুকুই এগিয়ে গেছে। (অধিকাংশ মুসলিম দেশের শাসকদের প্রভু হলঃ আমেরিকা/পশ্চিমা বিশ্ব। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর সাথে অন্যদের পার্থক্য হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় প্রভুও আছে, ভারত এবং তার সাথে তাদের পশ্চিমা প্রভু।) এই স্বাধীন জাতিটি ধীরে ধীরে ভারতের দাস

হিসেবে বিক্রি হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে সংঘটিত হওয়া বিডিআর বিদ্রোহের নির্মম হত্যাযজ্ঞ প্রমাণ করে যে, শাসকগোষ্ঠী ভারতকে খুশি করতে কতদূর যেতে পারে। অল্প কিছু সৈন্য যখন এই পক্ষপাতমূলক সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল তাদের এমনভাবে দমন করা হল যেন তারা বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে আসা বিদেশি শত্রু। এমনকি তাদের পরিবারের সদস্যদেরও নিরাপত্তা বাহিনীদের হাতে অশালীন অবমাননার শিকার হতে হল। সবশেষে যখন এই গণহত্যার পেছনে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা প্রকাশ করে দেবার জন্য কিছু মানুষ যখন ইশতিহার বিলি করার সাহস দেখাল তখন তাদেরকেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপবাদ দিয়ে নাস্তানাবুদ করা হল। বর্তমানে বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভাব শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এমনকি সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এই মুসলিম রাষ্ট্র ভারতীয় উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে। মসজিদের শহর ঢাকা মূর্তির শহরে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পূর্ণ সহায়তায় নোংরা ও জঘন্য হিন্দু সংস্কৃতি ক্যান্সারের মত বিস্তার লাভ করছে। মদ্যপান ও মাদকাসক্তি বর্তমানে ব্যাপক বিস্তৃত। অশ্লীলতা বর্তমানে একটি অপরাধে পরিণত হয়েছে। সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠন, অল্পবয়সী তরুণীদের যৌন হয়রানি করা এবং এই সকল অপরাধের ভিডিও ধারন করে তা দ্বারা হয়রানির শিকার তরুণীদের ব্ল্যাকমেল করা একটি দৈনন্দিন কার্যক্রম বানিয়ে নিয়েছে। এমন একটি দেশ যেখানে মানুষজন বেঁচে থাকার অধিকারটাও পায় না, সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের ওকালতি করছে যাদের এই সমাজ কলুষিত করার অপরাধে হদ্দ শাস্তির (ইসলামে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি) মুখোমুখি করা উচিৎ। এইতো সেদিন এক কনফারেন্সে ছাত্র সংগঠনটির ভাইস ইউনিয়নের সভাপতিকে মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পাশে বসতে দেওয়া হয়েছিল। এই মহান মিটিং এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যভিচারের বৈধতার পক্ষে ওকালতি করা। ক্ষমতাসীন দলের তীব্র ইসলাম বিদ্বেষ বোঝা যায় সংবিধান থেকে 'মহান আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থা' লেখাটি যা আগে থেকেই অকার্যকর ছিল, তা তুলে দেওয়ার মাধ্যমে! সুতরাং, কেন একজন মুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এই সিস্টেমের প্রতি এক পয়সারও আনুগত্য করবে? কেন একজন এই সিস্টেমের আইন কানুন মেনে চলবে যে সিস্টেমের বৈধ-অবৈধ বিষয়গুলো এমন সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত যে সংবিধান আমাদের রবের নাম ও সহ্য করতে পারে না? ইসলামের কোথায় আপনি দেখবেন যে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে এই দূষিত 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়' শিকলবদ্ধ করে রাখাটাকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হচ্ছে? কেন আপনি এমন একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাবেন যে সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে আপনাকে এমন একটা পরিস্থিতিতে নিয়ে যাবার জন্য যেখানে আপনাকে পশ্চিমাদেরই দাস হয়ে থাকতে হবে? এই অকার্যকর পথে আমাদের কর্মশক্তি বিনষ্ট করা থেকে ফিরে আসার জন্য কি আলজেরিয়া, তুরস্ক এবং সবশেষে মিসরের অভিজ্ঞতাগুলো যথেষ্ট নয়? প্রবাদ আছে, বারবার বিভিন্ন ভুল করে একই ফল পাওয়াটা বোকামি নয়, বরং বোকামি হল একই ভুল বারবার করে বিভিন্ন ফল আশা করা। আমাদের অবশ্যই এই সিস্টেমের সাথে নিজেদের বেড়িবদ্ধ করা উচিৎ না যে সিস্টেমে আমাদের জনসাধারণকে কিছুই দেবার নেই।

মতিঝিল ও সাতক্ষীরায় ঘটে যাওয়া গণহত্যাগুলোর কারণে আমরা যেন আমাদের উদ্দীপনা না হারিয়ে ফেলি। চলুন, আমরা প্রমাণ করে দিই যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, প্রহসনমূলক বিচার, নেতৃস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিদের ফাঁসি এবং সর্বশেষ ব্যাপক হারে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড- এগুলোর কোন কিছুই আমাদের পথের বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারবে না। যে উদ্দীপনা এদেশের যুবকদের ইসলাম ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে এক নাস্তিক ব্লগারের ছড়িয়ে পড়া বিষ দমনে অনুপ্রাণিত করেছিল, আসুন আমরা তাদের সে আশা পূরণ করি। আলহামদুলিল্লাহ্‌, দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই এখন নির্বাচনে ভোটদানের বিপক্ষে। এখন আমাদের সময় এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আরও অর্থবহ কিছু করার। যখন ব্যালট পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়, যেটা সবসময়ই হয়ে থাকে, তখন বুলেট পরিবর্তন আনে। এখন আমাদের সংগঠিত হওয়া উচিৎ একটি জনপ্রিয় ও সর্বব্যাপী বিপ্লবের জন্য। হ্যাঁ, এখন আমাদের সময় বিদ্রোহ করার। শুনতে যতই কঠোর লাগুক না কেন, হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র এই জমিনে এই অত্যাচারী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহই আমাদের প্রয়োজন। সেই সাথে চলুন, আমরা ফরায়েজী আন্দোলনের সেই উদ্দীপনার পুনর্জাগরণ ঘটাই আর আমাদের আসল শেকড়ে ফিরে যাই। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামের পুনর্জাগরণই আমাদের উত্তর হওয়া উচিৎ

বাংলাদেশের শাহবাগের গণজাগরণ

বায়তুল মুকাররম মসজিদের নিকটস্থ দোকানে পুড়িয়ে দেয়া কোরআনের দিকে তাকিয়ে আছে মুসলিমরা।

আল্লাহ ও তার রসুলকে অবমাননাকারী গোড়া নাস্তিকদের প্রচারণার প্রতিবাদ জানাচ্ছে বাংলাদেশি মুসলিমরা।

আল্লাহ ও তার রসুল অবমাননার প্রতিবাদে বিক্ষোভের সময় **RAB** অবস্থান

তাদের প্রতি, যারা এই মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করতে চায়।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ
وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ۝

**"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"**

**(আল কুরআন)**

এ কথা মনে রাখা উচিৎ যে উপরোক্ত আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের পর হিজরতের তৃতীয় বছরে নাজিল হয়েছিল। মুসলিমরা সবেমাত্র পরাজয়ের গ্লানিতে ভুগছিল। ইসলাম- শুধুমাত্র কয়েক হাজার অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় সীমাবদ্ধ; আর অন্যদিকে সমগ্র আরব ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিতে বদ্ধপরিকর। প্রবল বাতাসের মাঝে নিভু নিভু মোমবাতির মত ইসলামের আলোও নিভে যাবার মতন ভয়ানক পরিস্থিতিতে পড়েছিল। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ এই আয়াত নাজিল করে নিশ্চয়তা দিলেন যে ইসলামের আলো পূর্ণরূপে বিকশিত হবেই, কাফিররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পশ্চিম আফ্রিকার দূরতম স্থান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ও বার্মায় মুসলিম উম্মাহর জন্য নতুন ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে; তাহলে চলুন আল্লাহ্‌র তার দ্বীনের নূর পূর্ণরূপে বিকশিত করার ওয়াদার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আমরা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াই, প্রাচ্য ও পশ্চিমের কাফিররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। ■



বাংলাদেশ পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে

“আমরা নবুয়্যাতের পদ্ধতিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান জানাই। এমন খিলাফাহ নয় যা বিচ্ছিন্নতা, মিথ্যা, চুক্তি ও ওয়াদা ভঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।
আমরা এমন খিলাফাহ চাই যা ন্যায়পরায়ণতা, পারস্পরিক পরামর্শ, সঙ্গতি ও একতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
এমন খিলাফাহ নয় যা নির্দয়তা, মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্নতা, তাওহীদের পতাকাবাহীদের হত্যা এবং মুজাহিদদের কাতারগুলোর মধ্যে মতবিরোধ তৈরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।”

শায়খ আবু দুজানা আল পাশা

(আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন।)

# একটি ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থাকে ইসলামিক করার প্রচেষ্টা?

ড. জাভেদ আনসারি

র্তমানে আমরা একটি যুগের ক্রান্তিকাল পার করছি। যেকোনো যুগের শেষে, ভবিষ্যৎ হয় সাধারণত অস্পষ্ট ও কুয়াশাচ্ছন। যদিও এই অস্পষ্টতার মধ্য দিয়েই একটি বিষয় সোজাসুজিভাবে বলে দেওয়া যায় যে, পুঁজিবাদ আর বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে তার গতি ধরে রাখতে পারবে না। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের ফল স্বরূপ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার অন্তিম মুহূর্তে পৌছে গিয়েছে।

পুঁজিবাদের মূল কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, একটি সমাজ বা একটি রাষ্ট্র যার পিছনে শুধুমাত্র পুঁজি আহরনের নিমিত্তেই পুঁজি আহরন করার "প্রজ্ঞা" কাজ করে। একজন ব্যক্তি যিনি এই ভিত্তির উপর নিজের কর্মসমূহকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে, পৃথিবীতে মানুষের ছলনাময় কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে, তিনিই মুলত একজন পুঁজিবাদী।

এটা মোটেও জরুরি নয় যে তাকে সম্পদশালী হতে হবে। উসমান বিন আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন অত্যন্ত ধনী কিন্তু তিনি একজন পুঁজিবাদী ছিলেন না। একইভাবে উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে শেঠ ওয়ালী ভাই ও (খিলাফত আন্দোলনের, ১৯১৯-১৯২৩, পরিচালনা পরিষদ এর প্রধান) একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু পুঁজিবাদী ছিলেন না।

পুঁজিবাদ এর মূল স্বরূপ হচ্ছে, পুঁজি হচ্ছে সম্পদের অন্যায় ব্যবহার এর ফল। যখন সম্পদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে যায় অসীম পরিমানে বর্ধিতকরণ, তখন সম্পদ হয়ে যায় পুঁজি। এই অর্থে পুঁজি হচ্ছে লোভ ও লালশার বস্তুগত রূপ। একজন পুঁজিবাদী দুটো রোগের দাস (আবদ আদ দিরহাম ওয়াদ দিনার)। একজন পুজিবাদী বিশ্বাস করে যে সম্পদের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে ক্রমাগত এর পরিমান বৃদ্ধি করে যাওয়া। তাই প্রত্যেক কর্মজীবী, কৃষক ও সহায় সম্বলহীন পুজিবাদী এই 'প্রজ্ঞা'কে মেনে নেওয়ার সাথে সাথেই তার চরম দারিদ্রতার পরও নিজেকে পুঁজিবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করলো।

একটি পুঁজিবাদী অন্তরের সাথে সবচেয়ে ভাল মিল পাওয়া যায় এমন একটি সমাজের যা 'উপযোগবাদী' মূলনীতিগুলো গ্রহন করেছে। যেহেতু পুঁজি আহরন ব্যতীত কামনার অন্ধ অনুকরণ সম্ভব নয়, তাই একটি পুজিবাদী সমাজ হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যার ব্যক্তি পর্যায় হতে শুরু করে সামষ্টিক পর্যায়ে কর্মগুলো সম্পাদন হয় মূলত একটা উদ্দেশ্যেই আর সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ পুঁজি উত্তোলন করা। পুঁজিবাদী সমাজের বাজার নামে একটি স্বত্তা থাকে যা সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশীল। একটি পরিবারে সন্তানদের পড়ানো হয় যাতে তার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমান পুঁজি উত্তলোন করা যায়। একটি পরিবারের বিবাহের

প্রস্তাবগুলো আসে মূলত 'ভাবী' বর ও কনের অর্থনৈতিক অবস্থাকে মাথায় রেখে। প্রতিটা কাজের মুল্য নিরূপন হয় মুলত 'অর্থ' ও পুঁজিবাজার এর ভিত্তিতে। পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা যথারীতি 'সভ্য সমাজ' নামে পরিচিত, এখানে 'ধর্মের' সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

একটি সভ্য সমাজে ব্যক্তির কাজের মূল্য নিরূপন ধর্মের 'বাণী' বা নির্দেশ এর দ্বারা করা হয় না বরং তার (ব্যক্তির) অর্থ পুঞ্জিভূত করার উপর নির্ভর করে এ বিষয়টি। পুজিবাদী সমাজের সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ বিষয়টি নির্ধারণ করা হয় 'দাম' দ্বারা যা বাজার নির্ধারণ করে দেয়।

একটি পুঁজিবাদী সমাজে (যেমন লিবারেল ডেমিক্রেসি) সভ্য সমাজ সমৃদ্ধিসাধন করে কিছু প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে। যেমন-

১. বিশ্বাসের স্বাধীনতা

২. ব্যক্তি স্বাধীনতা যেখানে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে পরিচালনা করে এবং সে যেকোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত এবং সে মুক্তভাবেই তার পছন্দনীয় চিন্তাকে গ্রহন বা বর্জন করতে পারে।

৩. সমতার নীতি যেখানে সকল ব্যক্তিই সমান এবং এই দুষ্ট ব্যক্তিপূজার স্বত্বে স্বত্বাধিকারী।

৪. সহিষ্ণুতা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান করা উচিৎ।

এসকল মুলনীতিগুলো গঠন করা হয়েছে মুলত আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব কে ভিত্তি করে যা একজন মুমিনের বিশ্বাসের দুটি মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

১. প্রথমত, মানুষ আল্লাহর 'আবদ' বা গোলাম যেখানে 'মর্ডানিস্ট'দের মতে মানুষ একটা আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বনির্ভর সত্বা যার 'সৃষ্টিকর্তার' প্রয়োজন নেই।

২. জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শর্তহীন ও পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট নিজেকে সঁপে দেওয়া আর তথাকথিত 'মর্ডানিস্ট'রা মনে করে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দেওয়া। যেখানে আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তে বিশ্বাস করি, তারা মানুষকেই দৈব ক্ষমতা প্রদান করে রেখেছে। যেহেতু পুঁজিবাদ একটি ব্যবস্থা হিসেবে 'modernist ideals'কে ধারন করার চেষ্টা করে, এটা বলা ভুল হবে না যে পুঁজিবাদের 'মর্মবাণী' হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লা ইনসা' অর্থাৎ মানুষ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং পুঁজিবাদ মূলত আল্লাহ (সুব.) তার রসুলগন (আ:) এবং যত 'ইব্রাহীমী' দ্বীন আছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে।

যদিও পুঁজিবাদের উত্থান হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে, পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদী শক্তির রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় (যেখানে আমেরিকার মূল অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ান্দের সুকৌশলে সরিয়ে দেওয়া হয়) এটি সন্ত্রাসী রূপ ধারন করে এবং স্থিতি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় (যদিও পুঁজিবাদী কখনোই ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে আধিপত্য বিস্তার এ সফল হয় নি)।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে পুজিবাদের পতন আরম্ভ হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদ বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন। সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটির সম্মুখীন আজ পুঁজিবাদ তা হলো বুদ্ধিবৃত্তি। যে 'মর্ডানিস্ট' ও 'বুদ্ধিবৃত্তিক' দর্শন পুঁজিবাদ কে আধিপত্যের চূড়ায় নিয়ে যায় তা যুক্তিবলে 'ভ্রান্ত' বলে প্রমানিত হয়। যেসকল বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন পুঁজিবাদের 'পৌরাণিক গাথা' বিনির্মাণের জন্য দায়ী সেগুলাকে 'পোস্ট মর্ডানিজম' বলা হয়।

'পোস্ট মর্ডানিজম' এর মূলত প্রবক্তাগন ছিলেন মিচেল ফুকাল্ট[১], দেরিদ্দা[২], লিওটার্ড[৩] ও রর্টি[৪]। 'মর্ডানিজম' পরবর্তী বুদ্ধীজীবিরা যুক্তি দিয়ে প্রমান করে যে পুঁজিবাদের মুল বিশ্বাস যেমন 'স্বাধীনতা' ও 'প্রগতি' এসব অসারই নয় অসম্ভবপরও

(১) Michel Foucault (মৃত্যু. ১৯৮৪) ফরাসি দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্য সমালোচক।
(২) Jacques Derrida (মৃত্যু. ২০০৪) ফরাসি দার্শনিক যিনি theory of deconstruction তত্ত্বের জন্য খ্যাত।
(৩) Jean Francois Lyotard (মৃত্যু. ১৯৯৮) ফরাসি সাহিত্যিক যিনি তার "Articulation of Post-modernism" এর জন্য খ্যাত।
(৪) Richard McKay Rorty (মৃত্যু. ২০০৭), মার্কিন দার্শনিক।

সত্য হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি অসম্পূর্ণ টুকরায় পরিণত হয়। মর্ম উদ্ধার করা একটি ভাষার খেলায় পরিণত হয়(!)। কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সমষ্টিগত কাজ বিশ্বাসের ভিত্তিতে অর্থপূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বটে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে একটি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যক্তি সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়। সকল কিছু ভাষা নিয়ে খেলাই হয়ে যায়। কোন কাজই তা ব্যক্তিগত হোক বা সামষ্টিক হোক তার সাথে ‘বিশ্বাসের’ কোন সম্পর্ক থাকে না। তাই পুঁজিবাদী ব্যক্তিত্ব সব সময় বিভেদে রত থাকে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে দ্বিতীয় বৃহৎ সমস্যার মোকাবেলা করছে তা হচ্ছে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এটাকে জীবিত রেখেছিল এগুলো আশংকাজনকভাবে কমছে। পুজিবাদ বাজার ব্যাবস্থা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রন করত কিছু ব্যাক্তি বা গোষ্ঠি। এই জন্য প্রতিযোগিতা বিলিন হয়ে যাচ্ছে। বাজার ব্যাবস্থা কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত নয়। এবং মুল্য নির্ধারণের কোন মাপকাঠি নেই। পুজিবাদী পন্য ও অর্থ বাজার এর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। পুজিবাদের যে সঙ্কট শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে তা আজ অবধি শেষ হয়নি।

প্রতিষ্ঠাগত সঙ্কটের অন্যতম বড় কারণ যা পুজিবাদ ব্যবস্থা মোকাবেলা করছে তা হল- আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুজিবাদী ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত কর্মী আন্দোলন এখন স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে “নতুন সামাজিক আন্দোলন” যেমনঃ- সমঅধিকার, পরিবেশবাদী এবং গে আন্দোলন (গে আন্দোলনের ঘোর সমর্থক স্বয়ং বারাক ওবামা নিজে)। আর এইসব আন্দোলন পুজিবাদের মৌলিক ক্রমের কোন অংশের ভিতরেই কাজ করতে পারবে না।

পুজিবাদী ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা হারানোর তৃতীয় বৃহৎ কারন হচ্ছে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন। মিডিয়াতে পুজিবাদী ব্যবস্থার দৌরাত্ম্যের জন্য সাধারন জনগনের জনমতের কোন গুরুত্ব থাকে না। তথাপি মিডিয়া জনমতকে নিয়ে ব্যাবসা করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও আস্তে আস্তে তার গ্রহনযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। প্রচার হচ্ছে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান মূলধন। ইউরোপে ধারাবাহিকভাবে ভোটারদের উপস্থিতি কমছে। ১৯৪৫ সাল থেকে কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মোট জনগণের তুলনায় জয় লাভ করতে পারে নি। কেন মানুষ ভোট দিবে যেখানে মিডিয়া এক সপ্তাহ আগেই কে নির্বাচনে পাশ করবে (সম্ভাব্য) তা বলে দেয়। এই জন্য অনেক ইউরোপীয়ান

*মিডিয়াতে পুজিবাদী ব্যবস্থার দৌরাত্ম্যের জন্য সাধারন জনগনের জনমতের কোন গুরুত্ব থাকে না। তথাপি মিডিয়া জনমতকে নিয়ে ব্যবসা করে।*

হওয়া উচ্চমানীয় ব্যক্তিবর্গের উপর ভিত্তি করে। যেরকম আমরা জানি, সবচেয়ে দৃশ্যমান পুঁজিকরণ সম্পন্ন হয়েছিল যখন পুঁজিবাদের পূর্ণবিকাশ উচ্চমানীয়দের ছিল। উচ্চমানীয় সংগঠনের কর্মচারী (ব্যবসায়ী সজ্ঘসমূহ এবং গণতান্ত্রিক দল সমূহ), যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কাঠামোর ভিতরে কাজ করেছেন, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এইভাবে তাঁরা এই ব্যবস্থায় আত্ম-সংশোধন প্রক্রিয়ার মত সেবা দিয়ে গেছে। পুজিবাদী ব্যাবস্থা ঠিক থাকার পিছনে এইসব সামাজিক গনতান্ত্রিক দলসমূহের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম যা কেইনের কাজ থেকে বুঝা যায়।

বর্তমানে পুজিবাদী রাষ্ট্র এমন ভাবে কর্মী আন্দোলনকে সপৃক্ত করেছে যেখানে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় প্রায় অসম্ভব। এটা ঘটেছিল যখন ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ অংশ (বিশেষ করে ছাত্র, বেকার, পেশনভোগী) তাঁরা রাজনীতি থেকে দূরে ছিল এবং উৎপাদন খাতে তাদের বিচরন খুব সামান্যই ছিল। পশ্চিমা রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী নয়। হেবারমাস, একজন শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানতত্ত্ববিদ আধুনিকবাদী/পুজিবাদী রক্ষক বলেন, পারস্পরিক সমঝোতা এমনভাবে বিকৃতি হয়েছে যে , গণতন্ত্রের মধ্যে সংলাপের কোন স্থান নেই। ঠিক একই ভাবে এলিয়ান ভেদউ বলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে একটি শিকল যা দ্বারা জনগণের ঘোড়াগুলোকে পুজিবাদের আস্তাবলে বেঁধে রাখা হয়।

চতুর্থত, শীর্ষস্থানীয় পুজিবাদী রাষ্ট্রগুলো একের পর এক সামরিক পরাজয় বরণ করছে। আমেরিকা বাধ্য হয়েছিল ইরাক থেকে চলে যেতে, যেখানে তাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি পন্ড হয়েছিল। আমেরিকা আফগানিস্থান থেকেও অপমানজনকভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করছে যখন বলিভিয়া, ইকোয়েডোর, ভেনিজুয়েলা এবং কিউবা আমেরিকার আধিপত্যবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেছিল ল্যাটিন আমেরিকাতে।

## হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সময়কাল থেকে শুরু করে উসমানী খিলাফতের খলীফা আব্দুল হামিদের শাসনকাল পর্যন্ত মুসলিম সমাজে ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী আইন পরিষদ- এগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

যেহেতু পুজিবাদি ব্যবস্থার ধারাবাহিক পতন নিয়ে সন্দেহ থাকার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে, সেহেতু পরিবর্তন রূপরেখাও স্পষ্ট নয়। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যাকে তের এবং চতুর্থ শতাব্দীর রোমান সাম্রাজ্যের সাথে তুলনা করা যায়, যখন রোমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সমাজ এবং রাষ্ট্র পতনের দিকে আগ্রসর হচ্ছিল।

রোমান ব্যবস্থাপনায় চলছিল একের পর এক সমস্যা এবং তা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে । অধিকন্তু, তখন একটি বিকল্প ব্যবস্থা উত্থিত হচ্ছিল।

এই একই চিন্তাধারায়, আমাদের সময়ের রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান একটি নির্দিষ্ট সময়কাল থেকে পরিবর্তনশীল। দার্শনিক বোড্রিলারড বলেন যে, সংখ্যালঘু পুজিপতিরা রাষ্ট্রে ও সমাজে তাদের পান্ডিত্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের পুজিবাদ-বিহীন ধারনা ভিত্তিকে ধারণ করছে। পুজিপতি চক্রের অনুপাত সংকুচিত হয়ে আসছে। পুজিবাদি রাষ্ট্র ও সমাজের পতনের পর, আমরা দেখতে যাচ্ছি পুজিবাদ-বিহীন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে, ডেলিউজ দাবী করেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বরং কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এটি দেখার বাকী রয়ে গেছে যে, এই ব্যবস্থা আসলে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে না বেঁচে থাকার জন্য কেবল জটিল অবস্থার সৃষ্টি করছে?

### আধুনিক চিন্তাধারা ও পর্যালোচনায় ইসলামঃ

মুসলিম বিশ্বে পুজিবাদী ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল সম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতার নিষ্ঠুর ব্যাবহারের মাধ্যমে । সাধারণত, আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল সামরিক প্রতিরোধ। উপমহাদেশের মধ্যে, জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ সালে যখন সামরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। তখন থেকে, উপমহাদেশের বেশিরভাগ আলেম পুজিবাদী ব্যবস্থার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরন অবলম্বন করে যাচ্ছেন। এই আচরন ছিল দু'রকমেরঃ রাজনৈতিক চক্র হতে মুক্ত থেকে এবং সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহন করে, আর এটি করা হয়েছিল এ জন্য যাতে করে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামকে প্রবেশ করানো যায়।

সাধারনত, আলেমগন পূর্বের পদ্ধতিটি অবলম্বন করেন, ইসলামিক ব্যাক্তিত্ব ও আদর্শের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষে তাঁরা তাদের কাজগুলোকে একীভূত করেন। তাঁরা কাজ করেন ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছেন এই উপমহাদেশে অনেকগুলো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই বিবেচনায় দেওবন্দের আলেমদের অবদান এখানে চিরস্বরনীয়।

অন্য পথটি (পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ) প্রকাশিত হয়েছিল জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ এর খিলাফত আন্দোলন ও সাংবিধানিক সংগ্রাম এর মাধ্যমে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে একটি জায়গা তৈরি করার জন্য যাতে করে ইসলামিক মূল্যবোধ, ব্যাক্তিত্ব ও সমাজকে রক্ষা করা যায়। এ পথটিকে ইসলামিক শোধনবাদ বলা হয়ে থাকে। ইসলামিক শোধনবাদ পুজিবাদকে একটি পূর্ণ ব্যবস্থার মত বলে মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, ইহা পুজিবাদি ব্যবস্থা থেকে আলাদা এবং এতে চেষ্টা করা হয় পুজিবাদি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করা শরিয়াহ শিক্ষার মাধ্যমে ।

ইহা পরিষ্কার হওয়া উচিত ইসলামিক modernism & revisionism এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । ইসলামিক modernist শরিয়াহর শিক্ষা দেয় পুজিবাদির মানদণ্ডে এবং এই শিক্ষা তাদের modernist পুজিবাদি আয়নায় নিয়ে আসে । ইহা ঠিক বিপরীত ইসলামিক revisionism এর। যাইহোক, একটি জিনিষ দুইটার মধ্যেই বিদ্যমানঃ পুঁজিবাদের সাথে সংঘর্ষকে আবশ্যিক মনে করে না। দুটোই মনে করে যে, পুঁজিবাদের সাথে সমন্বয় সাধন যে শুধু সম্ভব তাই নয়, বরং অনিবার্য।

সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবার এই উপায় সর্বপ্রথম রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পাওয়া যায়। ইসলামি বিপ্লবি দলগুলো গনতন্ত্র এবং সংবিধানকে ইসলামি করা পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছিলো। ১৯৭০ এর পরে, সৌদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইসলামিকরণ শুরু হয়। এই প্রচারণার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সারা বিশ্বে ইসলামি ব্যাংক এবং ইসলামি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবে, ইসলামি সংশোধনবাদ (islamic revisionism) এবং ইসলামি অধুনিকতাবাদ (islamic modernism) ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলাফলের দিকে এগিয়ে যায় না, ইসলামি ব্যবস্থা তো পরের কথা। বরং এসব আন্দোলনের ফলাফল হচ্ছে ইসলামি ব্যক্তিসত্বা ও সমাজকে পূঁজিবাদী ব্যবস্থায় গিলে ফেলা।

আজ যখন পুঁজিবাদতন্ত্র ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং পশ্চিমাদের ইরাক ও আফগানিস্তানে মুজাহিদীনদের হাতে সামরিক পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে, যা একটি অনুকূল কৌশলকে সর্বনিম্ন অবিবেচ্য বলছে।

ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামী গণতন্ত্রকে উন্নীত করার মাধ্যমে কখনই খাইরুল কুরুনের (নবী করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেঈগণের (রঃ) যুগ) সেই স্বর্ণ যুগে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সময়কাল থেকে শুরু করে উসমানী খিলাফতের খলীফা আব্দুল হামিদের শাসনকাল পর্যন্ত মুসলিম সমাজে ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী আইন পরিষদ- এগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। আসল সত্য হল ইসলামী সংস্কারবাদীরা জিহাদকে উম্মাহর পুনঃজাগরণের পথ হিসেবে কখনই বেছে নিবে না এবং উনিশ শতকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের কাছে পরাজয়কে স্থায়ী বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়। এর ফলে এটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটানোর মাধ্যমে আমাদের শক্তি নষ্ট করার কোন যুক্তি নেই; এর পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অনেক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। যেটি কখনই উপলব্ধি করা হয়নি, সেটা হল, পুঁজিবাদকে অবলম্বন করার ফলে উম্মাহর নিজস্ব পরিচয়ের ক্ষতি সাধন।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব পুঁজিবাদের পদ্ধতিগত অবনতি সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন নন। তারা এখনও উনিশ শতকে আছেন যখন পুঁজিবাদতন্ত্র তার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় ছিল এবং এর কার্যকারী বাধা অনেকটাই কঠিন ছিল, কিন্তু অসম্ভব ছিল না (এই রকম কঠিন সময়েও মুজাহিদীনরা জিহাদ ছেড়ে দেন নাই)। আজ যখন পুঁজিবাদতন্ত্র ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং পশ্চিমাদের ইরাক ও আফগানিস্তানে মুজাহিদীনদের হাতে সামরিক পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে, যা একটি অনুকূল কৌশলকে সর্বনিম্ন অবিবেচ্য বলছে। ইতিহাসে কখনই কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত পরাভূত হয়নি। কোন ব্যবস্থাকে তার কেন্দ্রে বসে শুধু সাধারণ দাওয়াহ (প্রচার করা), প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা করে বা বড় বড় কথা বলে পরাভূত করা সম্ভব নয়। জার্মান জাতির কাছে রোমান সাম্রাজ্যের পরাজয় কি সফল ছিল না যা পরবর্তীতে একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছিল, যা ব্যতীত খ্রিস্ট জীবন ব্যবস্থা কখনই ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারত না। অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার উনার লেখনীতে এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রোমানদের পতনের পর খ্রিস্ট ধর্মকে পুরোপুরিভাবে আয়ত্ব করতে বেশীরভাগ ইউরোপিয়ানদের প্রায় দেড়শত বছর লেগেছিল।

তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, যদি না আমরা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সামরিকভাবে পরাজিত না করি এবং এই ব্যবস্থাকে এলাকা বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিতাড়িত না করি, আমরা কখনই পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করতে পারব না। যেহেতু আমরা ইসলাম বা অন্য কোন অর্ধপথ ভোগ করছি, তাই আমাদের সকল প্রাতিষ্ঠানিক, আত্মিক এবং প্রচার কাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে মিশে যাবে এবং ইসলামের জাগরণের জন্য যে প্রচেষ্টা তা একটি অকার্যকর আদর্শে পরিণত হবে। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই শুধু আত্মিক উন্নতি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগামীর মাধ্যমে তার প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি করতে হলে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন। জিহাদের মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের পরই মানুষ ইসলামের দিকে দলে দলে যোগ দিল। এটি হল নবী কারীম (সাঃ) এবং উনার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর সুন্নাহ। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সময় থেকে শুরু করে সুলতান আব্দুল হামিদ ২য় এর সময়কাল পর্যন্ত, সকল ইসলামিক ইমারাত জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই সমস্ত সামরিক বিজয় ফিক্বহ, কালাম, উসুল এবং তাযকিয়াহকে সংগঠিত করতে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হিজরতের এক বছর পর জিহাদ শুরু করে দিয়েছিলেন, যেখানে ইসলামিক বিজ্ঞান লিখিত আকারে অনেক পরে এসেছিল।

সায়্যিদুনা আবু বকর (রাঃ)ও জিহাদকে প্রথমে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নির্দেশ পালনে উসামা (রাঃ) এর বাহিনীকে জিহাদে পাঠাতে এক মুহূর্তও দ্বিধাবোধ করেননি। মুরতাদদের বিপ্লবকে রুখে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি জাগ্রত ইসলামিক খিলাফতকে সফলভাবে প্রতিরক্ষা করেন। এইভাবে জিহাদ উনার সমস্ত শাসনকালে বিদ্যমান ছিল।

উপসংহার করলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার শেষ পর্যায়ে আছে। এটি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভাজনের শিকার হয়েছে। এই অবস্থায় একজনের উচিত অবশ্যই থামা এবং নিজেকে প্রশ্ন করাঃ মুসলিম উম্মাহ কি পুঁজিবাদি ব্যবস্থা ও সংবিধানের ইসলামিকরণ চায়?

এটি সময় উম্মাহর ইসলামিক শক্তিগুলোর, বিশেষ করে পাকিস্তানের মুজাহিদীনদের দ্বারা অর্জিত সামরিক সাফল্যকে কাজে লাগানো যাতে করে ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং বিস্তারে একটি বাস্তবিক পরিকল্পনা হাতে নেয়া যায়। সমাজকে পুনঃগঠন এবং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত কাজকে সংগঠিত করার জন্য তারা অবশ্যই তাদের প্রয়াসকে সমন্বয় করবেন যাতে করে একতার প্রয়াস অর্জন করা যায় উম্মাহর জন্য আর ভাল ভবিষ্যৎ আশা করা যায় ইনশা আল্লাহ। ☐

*(ডা. জাভেদ আকবর আনসারী, ইসলামিক ব্যাংকিং এবং গণতন্ত্র: একটি সমলোচনা মুলক বিশ্লেষণ। লেখক একজন অর্থনীতিবিদ, পুজিবাদী এবং পশ্চিমা আদর্শ ও রীতি-নীতির সমালোচক।)*

এটি সময় উম্মাহর ইসলামিক শক্তিগুলোর, বিশেষ করে পাকিস্তানের মুজাহিদীনদের দ্বারা অর্জিত সামরিক সাফল্যকে কাজে লাগানো যাতে করে ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং বিস্তারে একটি বাস্তবিক পরিকল্পনা হাতে নেয়া যায়।

আদম ইয়াহিয়া গাদান
(আল্লাহ তার উপর রহম করুন)
ইসলাম ও জিহাদের
পথে তার প্রত্যাবর্তন...

শীঘ্রই আসছে...

# উপেক্ষিত বাস্তবতা

উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহিমাহুল্লাহ)

আমরা বাস করতেছি "তথ্যের যুগে" যেখানে কিছুই এড়িয়ে যায় না মিডিয়ার মাইক্রোস্কপিক চোখকে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয় যেটা দুনিয়ার কারো কাছে কোন ব্যাপারই না সেটা প্রায়শই পত্রপত্রিকা এবং টেলিভিশনে হেডলাইন হিসাবে জায়গা করে নেয়। প্রত্যেকটি ঘটনা, যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, আলোচনা, বিতর্ক এবং বিশ্লেষণে জায়গা পেয়ে যাচ্ছে।

হ্যা, তথ্যের বন্যার মধ্যে... সবচেয়ে দৃশ্যমান 'বাস্তবতা'- আমি আবার বলছিঃ 'বাস্তবতা' এবং শুধু তথ্য নয় - বিশাল

## আফগানিস্তানে আমেরিকা এবং ন্যাটোর পরাজয় হল তাদের জন্য এক মহা সত্যের চ্যালেঞ্জ যারা দাবি করে যে 'মানুষ এই মহাবিশ্বের মালিক এবং মানুষই তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক'।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চোখ থেকে আড়ালে রয়েছে!

এই বিশ্ব এবার সাক্ষী হল সর্বকালের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা; যেটাতে রয়েছে মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য গভীর অনুধাবনের খোরাক। কিন্তু আসল সমস্যাটি হল, খুব কমই বাস্তবে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইতিহাস এসব বিষয়কে খুব গুরুত্বের সাথে দেখে; কিন্তু এবারের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিশাল অংশ যেন বেখেয়ালেই চলে যাচ্ছে। পশ্চিমারা অনেককাল যাবত নিজেদের মনে করে আসছে যে, তারা হল মানবজাতির উন্নতির চূড়া। পশ্চিমা বিশ্ব আরও বিশ্বাস করে যে, এটাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষসীমা। বস্তুত, কিছু পশ্চিমা চিন্তাবিদ এত বেড়ে গিয়েছে যে তারা এখন দাবি করে যে, পশ্চিমা বিশ্ব হল "ইতিহাসের শেষ"! বলাবাহুল্য যে, এই দাবি নিশ্চিতভাবে অবাস্তব ও অবান্তর; তবে এটা সত্য যে, পশ্চিমা বিশ্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদমই আলাদা। যেমন, আমেরিকা আবিষ্কারের মত তুলনীয় কোন কিছুই ইতিহাসে কেউ খুজে পাবে না, কারন এই মহাদেশ আপাতভাবে সীমাহীন উন্মুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এই মহাদেশের আবিস্কার এবং তৎপরবর্তী উপনিবেশের অসমানুপাতিক প্রভাব শুধু পশ্চিমা ইতিহাসেই নয়, বাকি বিশ্বের পাতায়ও রয়ে গেছে। রোমান সভ্যতার পর, পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকা গত শতাব্দি ধরে সারা বিশ্বে অতুলনীয় আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। বস্তুতঃ বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ একমত যে গত শতাব্দিতে আমেরিকা অতীতের সকল সম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে বৈশ্বিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে।

শুধু আল্লাহর দয়ায়, এই পশ্চিমা সভ্যতা, উপরের এত উল্লেখিত ব্যাপার সত্ত্বেও, মুখোমুখি হয়েছে ঐতিহাসিক পরাজয়ের যেটা ইঙ্গিত দিচ্ছে তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্মূলের! হ্যাঁ, এটা ঘটেছে শুধু মাত্র আল্লাহর দয়া ও ইচ্ছায়..... কারণ, বাস্তবিকভাবে এই অসমান লড়াইয়ে, পশ্চিমা বিশ্বের বিপক্ষ সেনাবাহিনীর আপাত কোন সুযোগই নেই টিকে থাকার। এমনকি বিপক্ষ সেনাদের শুরুতেও ছিল না প্রাথমিক পর্যায়ের সফল গেরিলা যুদ্ধ চালানোর মত কোন ব্যবস্থা, এমনকি ছিল না কোন নিরাপদ আশ্রয়ও। কোন প্রতিবেশি দেশও তাদের আশ্রয় দিতে চায় নি। কোন রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধাও ছিল না আন্দোলনের বার্তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার। সেই দুই সেনাবাহিনীর শক্তি ও অস্ত্রের মাঝে ছিল আকাশ পাতাল ব্যবধান। শুরু করার জন্য সেই সেনাবাহিনীর বস্তুগতভাবে কিছুই ছিল না।

হ্যাঁ, যুদ্ধের ১৩ বছর পর, এই সেনাশক্তি সীমিত সরঞ্জাম দিয়ে তাদের থেকেও হাজারগুণ বেশি শক্তিধর পশ্চিমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন হল, এই খবরের চেয়ে অন্য খবর কি বেশি প্রচার পাওয়ায় উচিত? অন্য কোন বিষয় কি এই বিষয়ের চেয়ে বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনার যোগ্য ?

পশ্চিমা বিশ্বের সকল থিংক-ট্যাংক এবং বুদ্ধিজীবীদের কি উচিত না, খুঁজে বের করা সেই গুপ্তকে যার কারনে আজ অপরাজেয় সম্রাজ্যবাদী শক্তির অপমানজনক পরাজয় হয়েছে? যদি অতুলনীয় মিলিটারি পাওয়ার, অসাধারন অর্থনৈতিক শক্তি এবং আকাশচুম্বি বিজ্ঞানের উন্নতি এই আমেরিকাকে রক্ষাই না করতে পারে কয়েক হাজার মুজাহিদিনদের হাতে পরাজয় থেকে, তাহলে এটা কি বস্তুবাদী সেক্যুলার আদর্শে বিশ্বাসীদের চিন্তা বা দুশ্চিন্তার কারন হতে পারে না?

আফগানিস্তানে আমেরিকা এবং ন্যাটোর পরাজয় হল তাদের জন্য এক মহা সত্যের চ্যালেঞ্জ যারা দাবি করে যে ‘মানুষ এই মহাবিশ্বের মালিক এবং মানুষই তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক’।

তাদের এই রকম পরাজয়ের বিষয়টি তাই সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের বিরাট এক চ্যালেঞ্জের দিকে ডাক দিচ্ছে যারা অদৃশ্যকে অস্বীকার করে এবং গোঁড়ামি করে - ডারউইনের ধর্মে – “সমগ্র বিশ্বজগত যদি আল্লাহর নিয়ন্ত্রনের অধীনে মনে করে জীবনের ব্যাখ্যা দেয়া হয় তবে তা হবে কোন যান্ত্রিক পদ্ধতির মাঝে বাহির থেকে কোন বস্তুর অনুপ্রবেশের মত”– শায়েখ আইমান আল জাওয়াহিরি – ফুরাসান তাহতা রায়াতুন নাবী (নবী সাঃ এর পতাকা তলের যোদ্ধা) অধ্যায় ৪ পাতা ৩৩৭ আসনাম আল তাগুত আরবা’আ (পাশ্চাত্যের চিন্তার ৪ মুর্তি)

আমরা দেখতে আগ্রহী কিভাবে সেক্যুলার এবং যুক্তিবাদের ধারক ও বাহকেরা এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সম্পূর্ণ বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। যদি এই বিষয় সেভাবে ব্যাখ্যা করতে যায়। অথবা এই মহাবিশ্বে আরও কিছু কি আছে যা ‘তথাকথিত জ্ঞানী’ সেক্যুলারিজম ও যুক্তিবাদের ধারকদের ধারনার বাইরে?

সত্য হল যে, তাদের ক্ষীণদৃষ্টির বাইরেও আরও অনেক কিছু আছে। এবং এটাই হল সেই বিষয় যা পশ্চিমা মিডিয়া এবং সরকার লুকানোর চেষ্টা করে আসছে। তারা খুব ভাল করেই জানে যে, তারা শুধু সশস্ত্র শক্তিতেই পরাজিত হয়নি, বরং মূল্যবোধ এবং আদর্শের যুদ্ধেও হেরে যাচ্ছে। তারা ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিতে সক্ষম, কিন্তু বিশ্বাস ও আদর্শের ক্ষেত্রে তারা যে কোন মূল্যে হার মেনে নিতে অনিচ্ছুক। তারা মেনে নিতে পারছে না যে আমেরিকার স্বপ্ন আজ বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। যে আদর্শ পশ্চিমারা পুজা করে আসছে তা আজ শুধুই মিথ্যা ! **ব্যাটমান, হবিস, রুশো ভল্টাইয়ার, হেগেল, কান্ট, এডাম স্মিথ এবং ক্লউসুইতজদের** দার্শনিক কল্পনা শুধুই আজ এক ব্যর্থ উপাখ্যান!

নিঃসন্দেহে ‘মানুষই’ হল সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কিন্তু যখন পশ্চিমারা বিদ্রোহ করল চার্চ এবং খ্রিস্টানদের কুসংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তখন তারা অবজ্ঞা করা শুরু করল মানুষের ভিতরের এক গভীর সত্যকে। দুর্ভাগ্যবশত, চার্চের বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহ- সচেতনভাবে বা অন্যভাবে - রূপ নিল সকল স্বর্গীয় বিধানের বিপক্ষে। সংক্ষেপে, এভাবেই মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক আলাদা হয়ে গেল ।

পশ্চিমা সভ্যতা দেখতে পেল না যে মানুষ কোন স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলাফল নয় যা একাই নিজে নিজে ঘটে; বরং সে হল পরাক্রমশালী আল্লাহর দুর্বল ও নিচু সৃষ্টি মাত্র, এবং বাস করছে একটি দুনিয়াতে যা নিয়ন্ত্রন এবং সাজানো হয়েছে উনার ইচ্ছায়। ইনি হলেন সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি অমুখাপেক্ষী এবং অভাবমুক্ত; যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক অনেক নবী পাঠিয়েছেন তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য - যাদের সর্বশেষ জন হলে মহানবী মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। ইনি হলেন তিনি যিনি যাকে খুশি তাকে সম্মান দেন এবং যাকে খুশি তাকে অপদস্থ করেন। যিনি সকল ভুলের উর্ধ্বে এবং কখনও দুর্বল ও পরাজিত হন না।

যে নির্ঘাত সত্যটি আজ লুকিয়ে রাখা হচ্ছে তা হল যে ইনি হলেন – পরাক্রমশালী আল্লাহ - যিনি ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালি জাতি পশ্চিমাদের হারিয়ে দিয়েছেন, ঠিক যেভাবে অতীতে বিভিন্ন পদস্খলিত জাতিকে ধ্বংস করেছেন । এবং তার প্রতি আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে, অন্য সকল ভুয়া খোদা অথবা আমেরিকার অত্যাচারের সামনে নতি স্বীকার করার বদলে ।

এই বাস্তবতাকে বলা হয় ‘তাওহীদ’, আল্লাহর একত্ববাদ । এটাই হল চরম সত্য যা পশ্চিমাদের মন থেকে উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। এটাই হল ইসলামের মূল এবং জিহাদীদের আন্দোলনদের আশীর্বাদপূর্ণ বার্তা ও এই ম্যাগাজিনের আহবান!

এটাই হল চরম সত্য যা পশ্চিমাদের মন থেকে উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। এটাই হল ইসলামের মূল।

# হে আমার মুজাহিদ ভাইগণ!

আপনাদের আমীরদের নির্দেশ আপনাদের দোষমুক্ত করতে পারবে না। কোন যাওয়াহিরি, কোন জাওলানি, কোন হামাবি অথবা কোন বাগদাদি আপনাদেরকে দোষমুক্ত করতে পারবে না যদি আপনারা আপনাদের মুজাহিদ ভাইদের উপর অন্যায় আগ্রাসন করেন। শেষ বিচারের দিন, তাদের প্রত্যেকেরই জবাবদিহিতা থেকে মুক্তির জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে... মনে রাখবেন, আপনি একাকী মৃত্যুবরণ করবেন, একাকী কবরে যাবেন, হাশরের ময়দানে আপনাদের প্রভুর সামনে একাকী দাঁড়াবেন এবং একাকী জবাবদিহি করবেন। এর কোনটিতেও আপনাদের আমীররা আপনাদের সাথে থাকবে না। তাই সেই ভয়াবহ দিনে কী জবাব দিবেন তা ঠিক করে নিন। আমি আপনাদেরকে সাফ বলে দিচ্ছিঃ যদি আমি যাওয়াহিরি আপনাদেরকে কখনো মুজাহিদদের উপর অন্যায় আগ্রাসনের আদেশ দেই, আমার আদেশ প্রত্যাখান করবেন; কারণ শেষ বিচারের দিন আমি আপনাদের কোন উপকারে আসব না।

শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরি
(আল্লাহ্ তাঁকে সুরক্ষিত রাখুন)

## পশ্চিমা অর্থনীতির

# মূলে আঘাত

হামযা খালিদ

মুসলিম বিশ্বের হাতে রয়েছে কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেনেগাল, মৌরিতানিয়া এবং মরক্কো উপকূল সংলগ্ন আটলান্টিক থেকে শুরু করে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থল ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সামুদ্রিক পথ। কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বের পাঁচটি chokepoint[১] রয়েছে মুসলিম বিশ্বের অধীনে এবং ষষ্ঠটি অর্থাৎ জিব্রাল্টার (যেটি ভূমধ্য সাগর আর আটলান্টিককে সংযুক্ত করেছে) রয়েছে মরক্কো ও স্পেনের অধীনে।

ইতিহাসের শুরু থেকেই সমুদ্রপথ স্থলপথের চেয়ে অধিক অরাজকতায় পূর্ণ এবং এটি এখনও খুব কমই নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা ৮০%[২] মালামাল সমুদ্র পথেই পরিবাহিত হয়। নিয়ন্ত্রন কষ্টকর এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব দুর্বল এমন অসংখ্য ধীরগতির ট্যাংকার জাহাজ দিয়ে বিশ্বের ৬০% তেল পরিবাহিত হচ্ছে[৩]। শোধনাগার থেকে সার্ভিস ষ্টেশন পর্যন্ত তেল পরিবহন ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জটিল যা নির্ভর করে তেলের টার্মিনাল, পাইপ লাইন, ট্যাংকার এবং ট্রাকের উপর।

পশ্চিমা অর্থনীতির শক্তির মূল উৎস হচ্ছে অসংখ্য মাইল জুড়ে বিস্তৃত পাইপ লাইন এবং সামুদ্রিক পথ। এই লাইন গুলো পশ্চিমা অর্থনীতির শুধুমাত্র সকল সক্ষমতার উৎস হিসেবেই কাজ করে না, এটি তাদের আক্রম্য অংশ এবং মুসলিম বিশ্বের তেলের উপর তাদের নির্ভরতাকেও ফুটিয়ে তুলে। এই সরবরাহ ব্যবস্থায় দীর্ঘ বিচ্যুতি আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বীমার খরচই শুধুমাত্র বাড়াবে না সেই সাথে বিশ্বের জ্বালানি বাজারের মূল্যে প্রভাব ফেলবে, ফলে পশ্চিমাদের জন্য আমাদের পেট্রোলিয়াম সম্পদ চুরি করা দুঃস্বপ্ন হয়ে পড়বে।

১ In military strategy, a chokepoint is a narrowgeographical feature, either on land (such as avalley, defile or a bridge) or at sea (such as a strait)through which an armed force is forced to passwith a narrow front, thereby greatly reducing itscombat power and allowing a numerically inferiordefender to successfully defend its position, oreven annihilate an attacker unable to bring hissuperior numbers to bear.

২ Anne Korin, Gal Luft, Terrorism Goes to Sea, Foreign Affairs, Nov/Dec 2004 (www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/p7545)

৩ World Oil Transit Chokepoints, US EnergyInformation Administration www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf

## হরমুজ থেকে সুয়েজ : ঝুঁকিপূর্ণ সামুদ্রিক পথ

জ্বালানিবাহী জাহাজগুলোকে ভৌগলিক কারণে কিছু নির্দিষ্ট কৌশলগত Chokepoint ব্যবহার করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলগত ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওমান ও ইরানের মধ্যেকার হরমুজ প্রণালি যা পারস্য উপসাগরকে ওমান সাগর এবং আরব সাগরের সাথে যুক্ত করেছে। এই প্রণালিটি ২১ মাইল লম্বা, এবং দুই মাইল চওড়া। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিদিন ১৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এই প্রণালি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

**"আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইইহ ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে আমার জাতির এমন কতগুলো লোকের নিকট উপস্থিত করা হল যারা রাজা-বাদশাহদের ন্যায় সমুদ্র ভ্রমণ করে আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।"**

ইয়েমেন উপকূলের বাব-এল-মান্দিব প্রণালীতে মুজাহিদরা ২০০২ সালে লিম্বার্গ নামক ফ্রান্সের একটি ট্যাংকার জাহাজে আক্রমণ করে৷ এই আক্রমণের ফলে এই প্রণালী দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে৷

## GLOBAL CHOKEPOINTS AND OIL ROUTES

millions of barrels per day | Risk of mines | Navigation Challenge | Risk of piracy/attacks on oil tankers

Heavy traffic poses challenge for oil tankers in the Turkish Straits
6th Fleet
2nd Fleet
3rd Fleet
7th Fleet
5th Fleet
2.9 Turkish Straits
Straits of Hormuz
Most of the oil passing through the Straits of Hormuz goes to Japan, India and China
Suez Canal 4.5
17
Highly susceptible to piracy and tanker attacks
Bab al Mandeb 3.3
Panama Canal 0.8
Most of the oil that passes through the canal is headed for the U.S.
15.2 Straits of Malacca
U.S. naval presence has increased in this area under the Obama administration
Less than 10% of Persian Gulf oil goes to the U.S.

২০১১ সালে সারাবিশ্বে মোট বাণিজ্যিক পণ্যের ২০% ছিল তেল এর মধ্যে ৩৫% সমুদ্র পথে পরিবাহিত হয়েছে। এই ৩৫% ভাগের ৮৫% ভাগের যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ান অর্থনীতি বিশেষ করে জাপান, ইন্ডিয়া ও চায়নার অর্থনীতি[৪]। লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত এই প্রণালীতে আক্রমণ চালানোর কারনে তেল পরিবহন ২৫% কমে যায়। যা আমেরিকা কে সেনা নামাতে বাধ্য করে[৫]।

হরমুজ প্রণালীর পরিবর্তে সৌদি আরব, ইরাক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানীবাহী পাইপ লাইন ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই লাইনগুলোর সামগ্রিক বহনক্ষমতা প্রণালী দিয়ে বাহিত তেলের চেয়ে অনেক কম। এইরকম একটি বিকল্প পাইপ লাইন হল কিরকুক-চেয়হান পাইপ লাইন। ২০১১ সালে ইরাক এই পাইপ লাইন দিয়ে ০.৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল চেয়হানের তুর্কি বন্দরে পাঠায়[৬]। কিরকুক-চেয়হান এবং গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু লাইন যেগুলো দক্ষিণের তেলক্ষেত্র থেকে উত্তরের ডিপোতে পাঠাতে ব্যবহৃত হয় সেগুলো আক্রমণের মূল লক্ষ্য হওয়াতে এগুলোকে বিকল্পের অযোগ্য করে তুলেছে[৭]।

হরমুজের আর একটি সবিশেষ বিকল্প হল ৭৪৫ মাইল লম্বা দীর্ঘ (অরক্ষিত) পূর্ব– পশ্চিম পাইপ লাইন। এটি পূর্ব সৌদি আরবের আবকাইক থেকে পশ্চিম উপদ্বীপের ইয়ানবুর লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। হরমুজের বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহার করলে মাত্র ২.৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল পরিবহন করা সম্ভব[৮]। তৃতীয় বিকল্পটি হল হাবসান থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ পর্যন্ত বিস্তৃত পাইপ লাইন। এটি দৈনিক ১.৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল পরিবহনে সক্ষম[৯] (ফুজাইরাহ বন্দর মার্কিন নৌ বাহিনী ব্যবহার করে, তাই এটি মুজাহিদদের নিকট আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ)। সর্বোপরি, এই বিকল্প পাইপ লাইনগুলোর সম্মিলিত সক্ষমতা হরমুজ প্রণালীর তেল বহনের সক্ষমতার কাছে নগণ্য।

পশ্চিমমুখী শিপিং এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ chokepoint হল বাব-এল-মান্দিব। এটি হর্ন-অফ-আফ্রিকা (জিবুতি, ইরিত্রিয়া এবং সোমালিয়া) এবং মধ্য পশ্চিম (ইয়েমেন) এর মধ্যে অবস্থিত। বাব-এল-মান্দিব লোহিত সাগরকে এডেন উপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। এটি ভূমধ্য সাগর এবং ভারত মহাসাগরের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ২০১১ সালে বাব-এল-মান্দিব

৪ Ibid. p. 2

৫ Anne Korin, Gal Luft, Terrorism Goes to Sea, Foreign Affairs, Nov/Dec 2004 www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/p7545

৬ World Oil Transit Chokepoints, US Energy Information Administration www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf (www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf)

৭ In the light of the recent military successes of the Mujahideen in Iraq, we hope that oil supplies to western countries from northern Iraq would seriously decline.

৮ *Ibid.* (Oil from Abqaiq is also transported to the Ras Tanura Terminal on the East Coast. An attempted attack on the oil pipeline feeding the Ras Tanura Terminal was foiled in 2001.)

৯ *Ibid.*

## VOLUME OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS TRANSPORTED THROUGH World CHOKE POINTS YEARS 2009-2011

| Location | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Strait of Hormuz | 15.7 | 15.9 | 17.0 |
| Bab al Mandeb | 2.9 | 2.7 | 3.4 |
| Suez Canal and Sumed Pipeline | 3.0 | 3.1 | 3.8 |
| Straits of Malacca | --- | --- | 15.2 |
| Turkish Straits | 2.8 | 2.9 | N/A |

* Estimates are in million barrels per day. N/A is not available. (Source: US Department of Energy)

দিয়ে প্রতিদিন ৩.৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বহন করা হয়, এর মধ্যে প্রতিদিন ২ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের গন্তব্য উত্তরের ইউরোপ এবং আমেরিকা[১০]।

সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে [১২]। প্রতি যাত্রায় ২ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বহনকারী সুপার ট্যাংকার জাহাজ গুলোর বীমা তিনগুন বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫০,০০০$ থেকে ৪,৫০,০০০$

SUMED (Suez Mediterranean) পাইপ লাইন ব্যবহার করা হয়। SUMED পাইপ লাইনের শুরু লোহিত সাগরের আইন সুখনা টার্মিনাল থেকে যা ভূ-মধ্য সাগর এর সিদি কেরির terminal এর সাথে যুক্ত। এটি দৈনিক ২.৩ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বহনে সক্ষম। সুয়েজ এবং SUMED বন্ধ করে দিলে

**সুয়েজ এবং SUMED বন্ধ করে দিলে সৌদি আরব থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ২৭০০ মাইল পাইপ লাইন ব্যবহার করতে হবে। যার ফলে ইউরোপে পরিবহনের ক্ষেত্রে ১৫ দিন এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে ১০ দিন সময় অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে।**

বাব-এল-মান্দিব ১৮ মাইল লম্বা এবং জাহাজ চলার জন্য মাত্র ২ মাইল চওড়া [১১]। এটিকে বন্ধ করে দেওয়া হলে পারস্য উপসাগর হতে ভূমধ্য সাগর এর জন্য সুয়েজ খাল এবং SUMED (Suez-Mediterranean) পাইপ লাইন দিয়ে নিয়ে যাওয়া তেল বহন বন্ধ হয়ে যাবে। এই সরবরাহ পথ বন্ধ হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে আরও দীর্ঘ পথ কেপ-অফ-গুড-হোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে) ব্যবহার করতে হবে। যার ফলে পরিবহন খরচ এবং সময় উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

ইয়েমেন উপকূলের বাব-এল-মান্দিব প্রণালীতে মুজাহিদরা ২০০২ সালে লিম্বার্গ নামক ফ্রান্সের একটি ট্যাংকার জাহাজে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে এই প্রণালী দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থা

হয়েছিল। যার ফলে সরবরাহকৃত প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্যের সাথে ১৫ সেন্ট যোগ হয়েছিল[১৩]। এই হামলায় একজন বুলগেরিয়ান নাবিক মারা যায় এবং ট্যাংকারটির অনুমানিক ৪৫ মিলিয়ন ডলার এর ক্ষতি হয় [১৪]।

লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে রয়েছে সুয়েজ খাল। ১৮৬৯ খনন করা এই খালটি ১৯৩ কিমি. লম্বা এবং ২০৫ মিটার চওড়া। এর মাধ্যমে আফ্রিকা পর্যন্ত না ঘুরে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়। ২০১২ সালে গড়ে ২.৯৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এই খাল দিয়ে বহন করা হয় যার মধ্যে ১.৬ মিলিয়ন ব্যারেল প্রতিদিন উত্তরের ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য সরবরাহ করা হয়। কিছু সুপার ট্যাংকার এত বড় যে সেগুলো এই খালে প্রবেশ করতে পারেনা। এইক্ষেত্রে, লোহিত সাগর থেকে প্রাপ্ত তেল খালের পরিবর্তে

সৌদি আরব থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ২৭০০ মাইল পাইপ লাইন ব্যবহার করতে হবে। যার ফলে ইউরোপে পরিবহনের ক্ষেত্রে ১৫ দিন এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে ১০ দিন সময় অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে[১৫]।

### সংকীর্ণ বসফরাস দিয়ে ইউরোপের তেল সরবরাহ

ভূ-মধ্য সাগরে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ chokepoint রয়েছে। তুর্কি প্রণালী এবং জিব্রাল্টার প্রণালী। Dardanelles

১০ *Ibid.*
১১ Encyclopedia Britannica (see Bab-el-Man-deb)

µ¶ Npcjgkgl_pwGltcqrge_rgmlGlbga_rcqMgjR_licp u_q?rr_aicb&uuu,lwrgkcq,mk-0..0-/.-//-
TBjA¢BtjTUBt?/ ?Tφφ?AAt j/11ĮŊĘŊ.Łj??)
µ· Rfpc_rqrmMgjRp_lqnmpr&uuu,g_eq,mpe-mgjrp_lqnmpr,frkj'
১৪ See Wikipedia: Maritime Jewel

১৫ www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf

এবং বসফরাস এর সমন্বয় হল তুর্কি প্রণালী, যা ইউরোপকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে। Dardanelles হচ্ছে ৪০ মাইল লম্বা খাল যা মারমারা সাগরকে Aegean এবং ভূমধ্য সাগরের সাথে যুক্ত করেছে, আর বসফরাস হল ১৭ মাইল লম্বা পানি পথ যা কৃষ্ণ সাগরকে মারমারা সাগর তথা ভূমধ্য সাগরে যুক্ত করেছে। বসফরাসের সবচেয়ে সংকীর্ণ পয়েন্টটি মাত্র আধ মাইল চওড়া[১৬]। জাহাজ চালানোর জন্য এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্গম খাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বছরে ৫৫০০ তেল ট্যাংকার সহ মোট ৫০,০০০ নৌযান তুর্কি প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করে। কৃষ্ণ সাগর এবং কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলের তেল কৃষ্ণ সাগরের বিভিন্ন বন্দর থেকে তুর্কি প্রণালীর মাধ্যমে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০১০ সালে দৈনিক ২.৯ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রাশিয়া তথা সাবেক সোভিয়েত থেকে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়[১৭]। অতিরিক্ত জাহাজের কারণে তুর্কি প্রণালীতে প্রায়ই জট লেগে যায়। এইজন্য পশ্চিম রাশিয়ান যেকোনো জাহাজের উপর আক্রমণ রাশিয়া এবং ইউরোপ উভয়ের অর্থনীতির জন্য দুঃসংবাদ বয়ে আনবে।

১৬ Encyclopedia Britannica (See Turkish Straits)
১৭ www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World-Oil-Transit-Chokepoints/wotc.pdf

ভূমধ্য সাগর অঞ্চলের আর একটি গুরুতপূর্ণ chokepoint হল জিব্রাল্টার প্রণালী। এই প্রণালীটি ভূমধ্য সাগর কে আটলান্টিকে উন্মুক্ত করেছে। এটির সবচেয়ে সরু অঞ্চলটি ৭.৭ ন্যাটিকাল মাইল (১৪.৩ কিমি.)[১৮]। এটিতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বৃটেন এই প্রণালীর স্পেনীয় অংশে সবসময় সৈন্য বাহিনী নিয়োজিত রাখে। লোহিত সাগর বা সুয়েজ খাল হতে পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকার জন্য ছেড়ে আসা ট্যাংকার গুলো এই প্রণালী দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়[১৯]।

## পূর্ব এশিয় অর্থনীতির জীবন পথ: মলাক্কা প্রণালী

মোট বাণিজ্যের পরিমানের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের অন্যতম একটি পথ। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এটি অবস্থিত এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে সংক্ষিপ্ততম পথ।

১৮ Encyclopedia Britannica (Strait of Gibraltar)
১৯ It is worth noting that in June 2002, a group of Mujahideen were arrested in Morocco for plotting attacks on western shipping in the Straits of Gibraltar.

এটি পারস্য উপসাগর অঞ্চল এবং ভারতকে চায়না, জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনীতির সাথে যুক্ত করেছে। এই ৮০৫ কিমি. লম্বা পানি পথ দিয়ে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ পন্য বহনকারী প্রায় ৫০,০০০ জাহাজ যাতায়াত করে। ২০১১ সালে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল পরিবাহিত হয়।

এই প্রণালীটি জাহাজ চলানোর জন্য কঠিন বিশেষ করে এর সংকীর্ণতম অঞ্চল ফিলিপস খাল যা মাত্র ২.৮ কিমি. চওড়া[২০]। এটি অসংখ্য ছোট নদী এবং ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত যা দস্যুদের লুকানোর জন্য এক উত্তম স্থান। International Maritime Bureau এর মতে, মালাক্কা প্রণালী পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলদস্যু অধ্যুষিত এলাকা[২১]। বীমার ক্ষেত্রে এটিকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ধরা হয়।

**প্রতি বছর বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ পন্য বহনকারী প্রায় ৫০,০০০ জাহাজ যাতায়াত করে। মালাক্কা প্রণালীর ৮০৫ কিমি. লম্বা পানি পথ দিয়ে**

২০ *Ibid.*
২১ International Herald Tribune www.iht.com/bin/printfriendl .php?id=7907480

## মুসলিম বিশ্বে USAF এর ঘাঁটি সমূহ

১. আফগানিস্তান (বাগরাম, হেরাত, জালালাবাদ, কাবুল, মাজার-ই-শরীফ, কান্দাহার, সিনদাদ)
২. বাগরাম অন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (আমেরিকান নেভি, এভিয়েশন সাপোর্ট ইউনিট)
৩. শায়খ ঈসা এয়ার বেইজ, বাহরাইন (৩৭৯ তম এয়ার এক্সপেডিশনারি উইং)
৪. আহমাদ আল জাবির এয়ার বেইজ, কুয়েত
৫. আলি আল সালিম এয়ার বেইজ, কুয়েত (৩৮৬ তম এয়ার এক্সপেডিশনারি উইং)
৬. মাসিরাহ এয়ার বেইজ (মাসিরাহ দ্বীপ, ওমানের পূর্ব বন্দর)
৭. থুমরেইত এয়ার বেইজ, ওমান (ওয়্যার রিজার্ভ মেটারিয়া স্টোরেজ, কন্ট্রাক্টর:ডিনক্রপ)
৮. মানাস আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, বিশকেক, কিরগিজিস্তান (৩৭৬ তম এয়ার এক্সপেডিশনারি উইং)
৯. আল উদাইদ এয়ার বেইজ, দোহা, কাতার, (ফরওয়ার্ড হেডকোয়ার্টার অব ইউএস সেন্টকম)
১০. ইসকান, রিয়াদের নিকটস্থ, সৌদি আরব (৬৪ তম এয়ার এক্সপেডিশনারি গ্রুপ)
১১. ইনকিরলিক এয়ার বেইজ, আদানা, তুর্কি (৩৯ তম এয়ার এক্সপেডিশনারি উইং, USAF ৫০০ এয়ারম্যান)
১২. আল দাফরা এয়ার বেইজ, আবুধাবী, UAE (৩৮০ তম এয়ার এক্সপেডিশনারি উইং)

## মুসলিম বিশ্বে আমেরিকান নৌ স্থাপনা সমূহ

১৩. ক্যাম্প জাস্টিস/ থাণ্ডার কভ/ নেভাল সাপোর্ট ফেসিলিটি, ডিয়াগো গার্সিয়া
১৪. ক্যাম্প লিমনিয়ার, ডিজিবুতি (US নেভাল এক্সপেডিশনারি বেইজ, USAFCOM হর্ণ অব আফ্রিকা)
১৫. নেভাল সাপোর্ট একটিভিটি, জুফায়ের, বাহরাইন, (US নেভাল ফোর্স সেন্ট্রাল কমাণ্ড এণ্ড US ফিফথ ফ্লিটের নিকটস্থ)
১৬. ক্যাম্প পেট্রিয়ট/ কুয়েত নেভাল বেইজ (কুয়েতের পূর্ব বন্দর)
১৭. ফুজাইরাহ নেভাল বেইজ, UAE
১৮. পোর্ট জাবেল আলি, দুবাই (মানব নির্মিত পৃথিবীর সর্ব বৃহত্তম বন্দর)

**মরণ কামড় :**

বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ গুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর মুজাহিদদের জন্য এগুলোর কৌশলগত গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন না করলেও, আমাদের শত্রুরা নিশ্চিন্তে আমাদের সম্পদ চুরি করার জন্য এর গুরুত্ব ঠিকই বুঝে। মার্কিন নৌ বাহিনী এবং তাদের সামুদ্রিক ঘাঁটির অবস্থান এর দিকে নজর বুলালে মুসলিম বিশ্বে তাদের মরণ কামড় স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়।

পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বকে ঘিরে আমেরিকা তাদের সামরিক ঘাটি তৈরি করে রেখেছে। আমেরিকার সেনাবাহিনী Unified Combatant Commands কাঠামো ব্যবহার করে। প্রত্যেক কমান্ডের অধীনে রয়েছে নৌ, জল ও স্থল বাহিনী যাতে ফলদায়ক নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায়। এরকম নয়টি কমান্ডের মধ্যে ছয়টি হল আঞ্চলিক। এভাবে আমেরিকা বিশ্বকে ছয়টি বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত কমান্ডে ভাগ করেছে। শত্রুদের দৃষ্টিতে ISLAMIC MAGHREB ব্যতীত মুসলিম বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM) এর 'দায়িত্বে' রয়েছে । আর Islamic Maghreb এর 'দায়িত্বে' রয়েছে আফ্রিকান কমান্ড (AFCOM)।

এই ডিভিশনের অধীনে রয়েছে ভূ মধ্য সাগরে অবস্থান করা মার্কিন ৬ষ্ঠ নৌ বহর। এটি মার্কিন নৌ বাহিনীর ইউরোপিয়ান কমান্ড দ্বারা পরিচালিত। উত্তর আফ্রিকা ও সাহারা অঞ্চলে ড্রোন অপারেশনের জন্য আমেরিকা Islamic Maghreb এ ড্রোন পরিচালনার স্থাপনা তৈরি করেছে। সেনেগাল মিলিটারির বেশীরভাগ ট্রেনিং, ফান্ড এবং সরঞ্জাম আমেরিকার দেওয়া। অপরদিকে সাহারা অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ ও Islamic Maghreb সন্ত্রাসী বিরোধী অভিযানের জন্য আমেরিকা থেকে ট্রেনিং ও সাহায্য পেয়ে থাকে। আমেরিকা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় Sao Tome এবং Principe দ্বীপে ঘাটি তৈরি করছে। এই ঘাটি আমেরিকাকে উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল দিয়ে যাতায়াত করা তেলের ট্যাংকার গুলোকে পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম করবে।

তুর্কির আদানার incirlik বিমান ঘাঁটিতে আমেরিকার 39th Air Base Wing এর ৫০০০ বিমান সৈন্য রয়েছে[২২]। সিনাইয়ে Task Force Sinai নামে আমেরিকার আর একটি ছোট বাহিনী রয়েছে[২৩] যারা Multinational Force হিসেবে ইসরাইল ও মিসরের মধ্যেকার শান্তিচুক্তি বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখে।

২২ United States Department of Defense, Base Structure Reports, quoted by National Post News Service

২৩ See Wikipedia: Task Force Sinai

ভূমধ্যসাগর এর দক্ষিনের ঘাটি গুলো হর্ন-অফ-আফ্রিকা, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরএ আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করছে। হর্ন-অফ-আফ্রিকা অঞ্চলের Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA) এর হেডকোয়ার্টার Camp Lemonnier এ অবস্থিত। জিবুতি-Ambouli আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মার্কিন নৌবাহিনীর অভিযান ঘাটি রয়েছে। CJTF হচ্ছে US Africa Command (USAFCOM) এর অংশ। এটির জিবুতি হেডকোয়াটার থেকে সোমালিয়ার আল-শাবাবের উপর ড্রোন হামলা করা হচ্ছে। সোমালিয়া উপকূলের মার্কিন নৌ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হিসেবে এই ঘাটি ব্যবহৃত হয়। officially CJTF এর হাতে রয়েছে সুদান, সোমালিয়া, জিবুতি, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সিসিলি এবং কেনিয়ার 'দায়িত্ব'।

বাব-এল-মান্দিবের অপর পার্শ্বে ইয়েমেনে পরিচালিত মার্কিন ড্রোন হামলা গুলো খুব সম্ভবত জিবুতির সাথে সাথে সৌদি আরবের ভিতর থেকেও পরিচালনা করা হয়। এরই মধ্যে হর্ন-অফ-আফ্রিকা অঞ্চলে আমেরিকা ড্রোনের জন্য চারটি airstrips তৈরি করছে যার একটি জিবুতিতে, একটি ইথিওপিয়াতে, একটি সিসিলিতে এবং অপরটি সৌদি আরব বা ওমানে তৈরি করছে[২৪]।

The Combined Task Force 151 (বিশটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত জোট)

২৪ National Post News Service

## পোর্ট জাবেল আলি শুধুমাত্র মানুষ নির্মিত সবচেয়ে বড় বন্দরই নয় এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে মার্কিন নৌবাহিনীর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বন্দর

এডেন উপসাগরে কাজ করছে। এটি মার্কিন নৌ বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড তৈরি করেছে, এর কাজ হল এডেন উপসাগরে বিশেষ করে সোমালিয়ায় ডাকাত ও সন্ত্রাস প্রতিহত করা (এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পাকিস্তান আর্মির rear-admiral কালীম শাউকাত ২০১২ সালে CTF-151 এর কমান্ডার ছিলেন[২৫]। যা স্বভাবতই এই প্রশ্ন তুলে যে, সোমালিয়ার ডাকাতি অথবা হর্ন-অফ-আফ্রিকার মুজাহিদদের মুকাবেলায় পাকিস্তানের স্বার্থ কি?)

পারস্য উপসাগর অঞ্চলের বাহারাইনের জুফফাইরের মার্কিন নৌঘাঁটি যা এই অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড এবং পঞ্চম নৌ বহরের হেডকোয়ার্টার হিসেবে কাজ করে[২৬]। পঞ্চম বহরের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, আরব সাগর এবং আফ্রিকার পূর্ব অঞ্চল। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে মার্কিন camp patriot (কুয়েতের নৌ ঘাটি), ফুজাইরাহ নৌ ঘাটি (UAE) এবং দুবাইয়ের পোর্ট জাবেল আলি বন্দর ব্যবহার করে। পোর্ট জাবেল আলি শুধুমাত্র মানুষ নির্মিত সবচেয়ে বড় বন্দরই নয় এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে মার্কিন নৌবাহিনীর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বন্দর[২৭]। প্রত্যেক আমেরিকান নাবিক যারা shipboard tour সম্পন্ন করেছে তাদের প্রত্যেকেই এই বন্দরে একবার হলেও এসেছে। এটিতে Nimitz-class[২৮] বিমানবাহী রণতরী এবং সেই সাথে অন্যান্য জাহাজ সহজেই জায়গা করে নিতে পারে।

আমেরিকা ভারত মহাসাগরে Diego Garcia নামক দ্বীপকে নৌ এবং ডুবোজাহাজের ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করে। এই দ্বীপটি বিমানবাহী রণতরীর স্থায়ী ঘাটি হিসেবে কাজ করে। এটি রসদ মজুদ রাখার সাথে সাথে সিআইএ এর গোপন Rendition Program এর পরিচালনা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

মালাক্কা প্রণালীর কাছের সিঙ্গাপুরের Sembawang নৌঘাঁটি সপ্তম নৌবহরের logistic support হিসেবে কাজ করে। জাপানের Okinawa তে Special Operations Command (SOCPAC) এর হেডকোয়ার্টার রয়েছে। বর্তমান সময়ে এটিকে সন্ত্রাস বিরোধি অভিযানের জন্য Joint Special Operations Task Force-Philippines হিসেবে দক্ষিণ ফিলিপাইনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে মার্কিন নৌ ঘাঁটির পাশাপাশি বিমানঘাঁটিও গড়ে তোলা হচ্ছে। এর বেশীর ভাগই তেল সমৃদ্ধ আরব উপদ্বীপকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে (মুসলিম বিশ্বে মার্কিন বাহিনীর অবস্থানের ম্যাপটি দেখুন)। এর পাশাপাশি আমেরিকার বিমান ঘাটি রয়েছে তুর্কিতে (Incirlik), আফগানিস্তানে, কিরগিজিস্তানে (Manas, Bishkek) এবং পাকিস্তানে (Jacobabad, Pasni, Dalbadin)।

কৌশলগত ভাবে এভাবে সৈন্য স্থাপন করে আমেরিকা গোটা মুসলিম বিশ্বকে মরণ কামড় দিয়ে রেখেছে। এই আগ্রাসন শুধুমাত্র সামরিক নয় এটি অর্থনৈতিকও বটে। এই সামরিক স্থাপনাসমূহের মূল লক্ষ্যই হলো বাধাগ্রস্থ করা। আমেরিকা তার উদ্দেশ্য পূরনের জন্য পরোক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেমন – অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর জোর প্রদান, কুটনৈতিক এবং বল প্রয়োগের হুমকি প্রদান। যখন এগুলো কাজ করে না তখন আমেরিকা বাধ্য হয়ে সৈন্য নামায়। আল্লাহর রহমতে মুজাহিদরা আফগানিস্তানে এবং ইরাকে আমেরিকার সেনাবাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছে। এই দুই যুদ্ধের

২৫ See Wikipedia: Combined Task Force 151

২৬ The Combined Maritime Forces (CMF), a 25 nation naval coalition to counter 'terrorism' in the Arabian Ocean, Persian Gulf, the Gulf of Aden and the Red Sea is also based in Bahrain (at Manama). The CMF comes under the purview of the US Naval Forces, Central Command.

২৭ See Wikipedia: Jebel Ali

২৮ The Nimitz Class aircraft carriers are a class of ten nuclear-powered aircraft carriers in service with the US Navy. These carriers generally have a length of 333 meters and a displacement of 100,000 tons. Nimitz Class carriers are one of the largest warships in the world.

**যেকোনো সুপার ট্যাংকারকে এইসব chokepoint এ যদি আক্রমন করা হয় বা হাইজ্যাক করে কোন সংকীর্ণ সামুদ্রিক পথে ছিদ্র করে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এর ফল হবে ভয়াবহ।**

অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাবে বলে দেয় যে মুজাহিদদের সাথে এই ধরনের কৌশল, হুমকি- ধমকি কোনই কাজে আসে না।

### চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ সমূহ

মুজাহিদদের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শত্রুর এই মরণ কামড় কে এমন ভাবে ধ্বংস করা যাতে তারা মুসলিম বিশ্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর সাহস না পায়। সেজন্য বহুমাত্রিক আক্রমণ নীতি ঠিক করতে হবে যাতে শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বে আমেরিকান বাহিনীর উপর আক্রমণই করা হবে না, সেই সাথে তাদের বিস্তৃত শক্তি সরবরাহ লাইন যা তাদের অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করছে সেটিও ধ্বংস করতে হবে।

## মধ্যপ্রাচ্যে নির্বাচিত তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনা সমূহ।
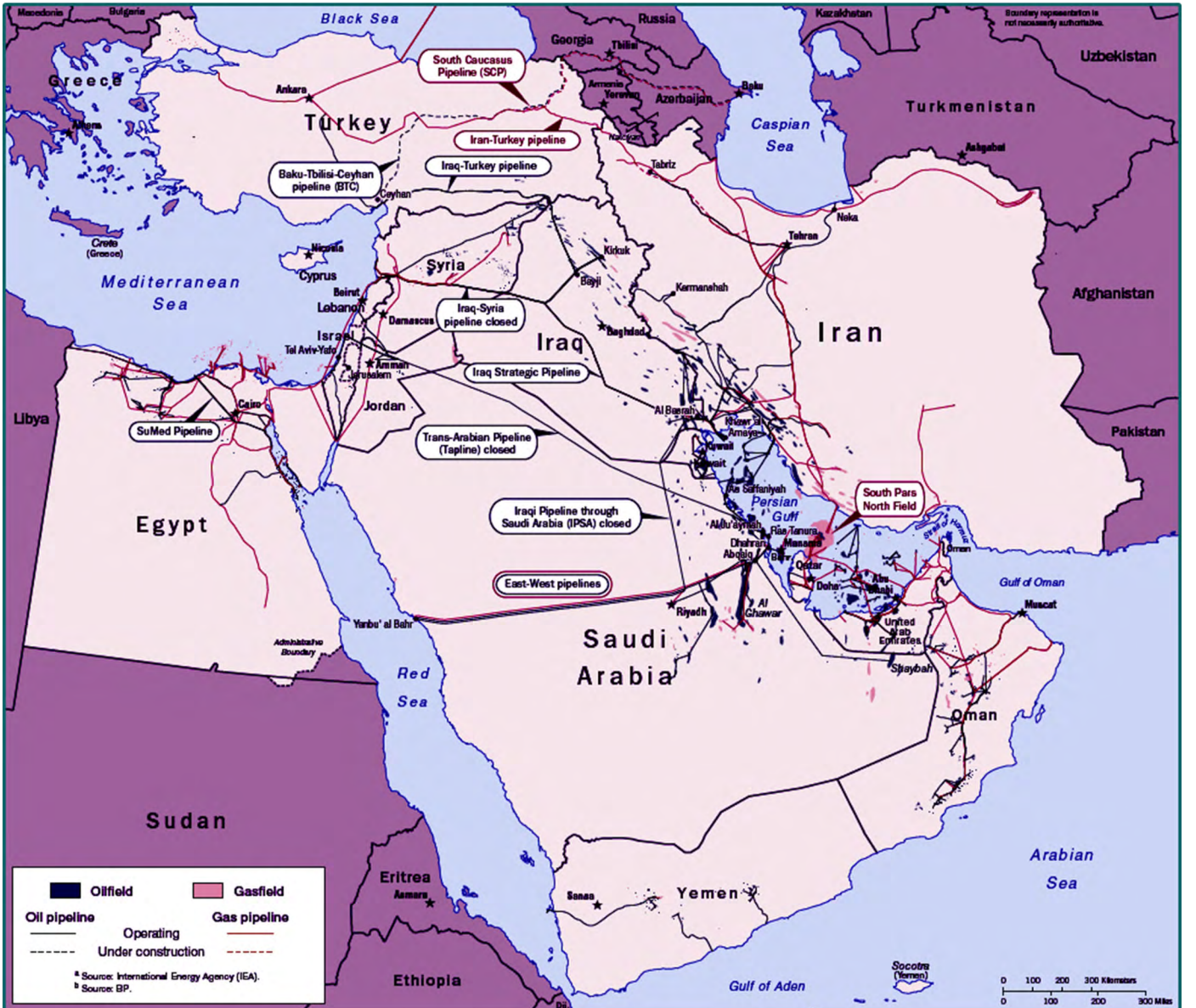
এই পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমমুখী জাহাজ গুলোকে মুসলিম বিশ্বের chokepoint গুলোতে আক্রমন করা অতি জরুরি। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মুসলিম বিশ্বের রিফাইনারি এবং তেলের টার্মিনাল থেকে পশ্চিমাদের জন্য বয়ে নেওয়া তেল তাদের জ্বালানী শিল্পের আক্রম্য অংশ হিসেবে কাজ করছে। যেকোনো সুপার ট্যাংকার (এমনকি পশ্চিমামুখী যেকোনো সাধারন কার্গো জাহাজ)কে এইসব chokepoint এ যদি আক্রমন করা হয় বা হাইজ্যাক করে কোন সংকীর্ণ সামুদ্রিক পথে ছিদ্র করে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এর ফল হবে ভয়াবহ: তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, মেরিটাইম ইন্সুরেন্স বৃদ্ধি পাবে এবং এই রুটে নিরাপত্তা দানকারী অতিরিক্ত বাহিনীর জন্য খরচ বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমা জাহাজ অথবা তেলের ট্যাংকারের উপর কয়েকটি chokepoint এ একসাথে আক্রমন চালালে আন্তর্জাতিক শিপিং বন্ধ হয়ে যাবে এবং energy market এর সংকট সৃষ্টি করবে। বন্দরে অবস্থান করা তেলের ট্যাংকার গুলোর প্রত্যেকটিই খুবই উৎকৃষ্ট টার্গেট।

উপরের নীতির উপর ভিত্তি করে এই আক্রমণ শুধুমাত্র সাগরের পশ্চিমা জাহাজের উপরই সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিম বিশ্বে যেসব পশ্চিমা কর্মী হিসেবে কাজ করছে তাদেরকেও টার্গেট করা যেতে পারে। ২০০৪ সালে মুজাহিদরা সৌদি আরবের খোবারের Yanbu al Bahr Petro-Chemical Plant and oil facilities এ এই ধরনের আক্রমন করে। এই আক্রমনের ফলে ২৮ জন বিদেশী যার মধ্যে বেশির ভাগ পশ্চিমা মারা যায় ফলে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায়[২৯]। Oil facilities, Including terminals and pipelines যেগুলো পশ্চিমা বিশ্বে তেল পৌছায় সেগুলোও ধ্বংস করা যেতে পারে। ২০০৬ এর ফেব্রুয়ারিতে আবকাইকে এই ধরনের আক্রমন চালানো হয়েছিল। পশ্চিমের জন্য তেল রপ্তানি করার সৌদি আরবের বিশাল oil facility তে দুইটি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি প্রবেশের চেষ্টা করে। যদিও নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলির কারনে এটি facilityর বাহিরেই বিস্ফোরিত হয়, তবু এটি সফল ছিল। এটি পুরাপুরি বাস্তবায়িত হলে তেল উৎপাদন দৈনিক ৬.৮ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে কমে ১ মিলিয়ন বা এর কম হত[৩০]। বিগত দিন গুলোতে মুজাহিদরা সিনাইয়ে ইসরাইলের LNG সরবরাহ লাইনে যে ধারাবাহিক আক্রমন গুলো চালায় সেগুলো এই ধরনের অর্থনৈতিক যুদ্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন নৌবাহিনীর উপর হামলা চালানোও অসম্ভব কিছু না। কিছু টার্গেট যেমন দুবাইয়ের জাবেল আলি বন্দর এরকম একটি। অন্যদিকে Camp Thunder Clove in Diego Garcia, জুফফাইরের Naval Support Activity, বাহরাইন এবং জিবুতির Camp Lemonnier ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। মুজাহিদদের কাছে এই ধরনের টার্গেট আর অসম্ভব কিছু না। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের যুদ্ধ জাহাজ দখল করে ভারত মহাসাগরে আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজে আক্রমনের লক্ষ্যে

২৯ Anne Korin, Gal Luft, Terrorism Goes to Sea, Foreign Affair , Nov/Dec 2004 (www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/p7545)

৩০ (www.csis.org/media/csis/pubs/060227_abqaiqa ack.pdf)

আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে মুজাহিদরা এর যথাযথ প্রমাণ দিয়েছেন।

আল্লাহর রহমতে মুজাহিদরা কৌশলগত chokepoint গুলোর খুব কাছে অবস্থান করছে। মুজাহিদরা উত্তর আলজেরিয়ার আটলাস পর্বতে সক্রিয় আছেন যা তাদেরকে আটলান্টিকের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করবে। সিনাইয়ে মুজাহিদরা দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। সোমালিয়ার মুজাহিদরা উপকূল পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং সেখান থেকে তারা সোমালিয়ার বাহিরে horn of Africa তে আক্রমণ চালানোর সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। আরব উপমহাদেশের আল কায়িদা এখন আদেন এ সক্রিয় রয়েছে এবং তারা উপসাগরে পশ্চিমা টার্গেটে আক্রমন চালানোর সক্ষমতা অর্জন করেছে। ইরাকের তেলের পাইপ লাইন গুলো বেশ কয়েক বছর ধরেই মুজাহিদদের আক্রমনের শিকার। বসফরাসও মুজাহিদদের আওতার বাহিরে নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পঞ্চম সর্বোচ্চ তেল সরবরাহকারী নাইজেরিয়ার[৩১] তেল facility গুলোতেও বিভিন্ন সময় আক্রমন চালানো হচ্ছে (এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী আক্রমন আমেরিকাকে অধিক কাহিল করে ফেলবে)। কিছুদিন হল সিরিয়ার মুজাহিদরা ভূমধ্য সাগরের উপকূল দখল করেছেন। এই উপমহাদেশে মাত্র কয়েকদিন আগেই মুজাহিদরা মার্কিন নৌবাহিনীর উপর আক্রমনের মত কঠিন একটি অপারেশনের প্ল্যানের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। এবং পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন জিহাদি গ্রুপ কাজ করছেন। ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের শত্রু জাহাজ গুলোতে সমন্বিত আক্রমন করলে তা শত্রুদের অর্থনীতিকে আঘাত করার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধে তাদের সম্পদকেও দূরে ঠেলে দিবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জলদস্যুতার কারনে (জাহাজ হারানো, কার্গো এবং বীমা পরিশোধ) বিশ্ব অর্থনীতি বছরে ১৬ বিলিয়ন ডলার হারায়।

"আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইইহ ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে আমার জাতির এমন কতগুলো লোকের নিকট উপস্থিত করা হল যারা রাজা-বাদশাহদের ন্যায় সমুদ্র ভ্রমণ করে আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।"[৩২] উম্মহারাম শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন), "আল্লাহর জন্য যারা আমার উম্মতের মাঝে প্রথম সাগরে ভ্রমণ করবে, তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে"। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন), "সিজারের শহরকে আক্রমণকারী আমার উম্মতের প্রথম সৈন্যদলকে ক্ষমা করে দেয়া হবে"। হাদীসের আলেমরা বলেন, এই হাদীস সামুদ্রিক যুদ্ধের ও রোমানদের সাথে যুদ্ধের (ইউরোপীয়ান খ্রিষ্টান) গুরুত্ব তুলে ধরেছে। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, "আল্লাহ সমুদ্রের মুজাহিদদের প্রতি অনেকবার হাসেন। তিনি প্রথম হাসেন যখন তারা পরিবার ও সম্পদ পেছনে ফেলে প্রথম জাহাজে চড়ে। তিনি তাদের প্রতি হাসেন যখন জাহাজ সমুদ্রে দুলতে থাকে। এবং তিনি তাদের প্রতি হাসেন যখন তারা প্রথম উপকূল দেখতে পায়।[৩৩, ৩৪]

তাই চলুন, জিহাদের মাধ্যমে শুধু আমাদের মাটি থেকেই নয় সমুদ্র থেকেও শত্রুদের উচ্ছেদ করি এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করি যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা করেছেন। □

---

৩১ www.cfr.org/world/terrorism-goes-to-sea/p7545

৩২ সহিহ আহমদ (দেখুন মাশারি আল আশওয়াক, ইবনে নুহাশ, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, অনুবাদ নুর ইয়েমেনি, পৃ. ৫৫)

৩৩ ইবনে আবী শায়বা [মাওকুফ] (Ibid., পৃষ্ঠা ৫৬)

৩৪ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ (সুব) কোন বান্দার দিকে তাকিয়ে হাসেন, ঐ ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে না।

“আর তোমাদের কী হল যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না সেই দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত পুরুষ, নারীও শিশুদের পক্ষে যারা ফরিয়াদ করছে, আমাদের এই জনপদ থেকে উদ্ধার কর, এর অধিবাসীরা বড় অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রক্ষাকারী নিযুক্ত করে দাও, এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দাও।”

(আন নিসাঃ ৭৫)

গেরিলা যুদ্ধে
কৌশলগত অতিপ্রসারতা
আবু ওবাইদা আল মাকদিসি
(আল্লাহ তার উপর রহম করুন)

# গেরিলা যুদ্ধে কৌশলগত অতিপ্রসারতা

*লেখককে আল্লাহ কবুল করুন, যিনি আফগানিস্তানে শায়খ সাইফ আল আদেলের ঘনিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন। তিনি শায়খ আবু জুবাইদাহ'রও একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি শুধু সামরিক কৌশল ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিয়ষেই বিজ্ঞ ছিলেন না, তিনি শরিয়াহর উপরেও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন শায়খ আবু ওয়ালিদ, শায়খ আবু মুসাব আস সূরি, শায়খ আতিয়াতুল্লাহ'র নিকট থেকে। গত গ্রীষ্মে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তিনি শাহাদাৎ লাভ করেন।*

ইতিহাস আমাদের বলে যে, অনেক সাম্রাজ্য যেখানে বৈশ্বিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল ধীরে ধীরে তা তাদের নিজস্ব খোলসের কারণেই নিজদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে এবং তারা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে।

আমেরিকার ঐতিহাসিক 'পাওয়েল কেনেডি'র মতে এই অবস্থাটা বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছেঃ

১. অভ্যন্তরিন নিরাপত্তায় অধিক ব্যয়।
২. সাম্রাজ্যিক অতিবিস্মৃতি বা প্রসারণ।
৩. শত্রু পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি যা তাদের শক্তির সমন্বয়ের সামর্থ্য

যখনই একটি বৃহৎ শক্তি তার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও মারাত্মক ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পথ ধরে অথবা পশ্চাদপসরনের সম্ভাবনা অবজ্ঞা করে তখন এর ফলাফল অপরিবর্তনীয় ভাবে ধীরে ধীরে কিন্তু স্থায়ীভাবে অধঃপতনের দিকে যায়। আমেরিকা বর্তমানে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন।

অতিবিস্তৃতির এই চিত্রটি যতটা জাতি বা সম্রাজ্যের জন্য প্রয়োগযোগ্য ঠিক ততটাই রাজনৈতিক আন্দোলন এবং জিহাদি দলের গেরিলা যুদ্ধের সাথে প্রাসঙ্গিক, সংগ্রামের সময় এবং স্থান যাই হোক না কেন।

একটি বড় রাষ্ট্র এভাবে যে বিপদের সম্মুখীন হয় জিহাদি দলগুলোও সেই বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। যার ফলে গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য "কৌশলগত বা বিস্তৃতি তত্ত্বের" অনুধাবন করা অতি জরুরী। তাদের অবশ্যই এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে হবে যাতে তাদের কাজ জিহাদের জন্য বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

**গেরিলা যুদ্ধের কৌশলগত প্রসারের ধরনঃ**

১. ভৌগলিক অবস্থান

ভৌগলিক অতিবিস্তৃতি ঘটতে পারে যখন একটি গেরিলা দল তাদের ঘাটির কাছের কোন এলাকায় সামরিক অভিযান চালায়, হোক এটি শহর বা গ্রাম এবং তারা তাদের স্থায়ী ঘাটি স্থাপনের মাধ্যমে ঐ এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই ধরণের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হবে তা পুরণের জন্য যদি প্রয়োজনীয় সেনাদল না থাকে তবে এটি জিহাদিদের জন্য বিপদজনক হতে পারে।

একটি এলাকায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন আনার জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সৈন্যদল থাকলেই হবে না; আগেই ভেবে নিতে হবে যে শত্রু পক্ষ কিভাবে এই দখল ও নিয়ন্ত্রনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে। যদি শত্রুপক্ষ মনে করে যে এই আধিপত্য তাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িত তাহলে এটি প্রতিহত করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবে না। এজন্য সামরিক অভিযানের

# হুমকির বাণী যদি কর্মে পরিনত করা না হয় তবে এটি খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়

পূর্বেই প্রত্যেক ধাপ হিসাব করতে হবে।

কোন এলাকায় শত্রুপক্ষ সেনাদলের উপস্থিতি নাই মানেই এই নয় যে তুমি ঐ এলাকার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে। বরং শত্রুরা ফাঁদে ফেলার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবেই ঐ এলাকা খালি করে দেয় যাতে তারা পরে এখানে এসে তীব্র আঘাত হানতে পারে। আর এতে তারা ঘেরাও করে সব ধ্বংস করে দিতে পারে। এটি হল গেরিলা দলের সাথে আর্মিদের সাধারণ এক নীতি। যার ফলে এই কৌশল সম্পূর্নভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এই বিষয়টি আবারও জিহাদি নেতাদের মনে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আমি একটি বাস্তব উদাহরণ দিব যেখানে জিহাদিদের অপরিকল্পিত দখলদারিত্বের প্রতিক্রিয়ায় শত্রুপক্ষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। তেহেরিক-ই-তালিবান, পাকিস্তান এর আমার ভাইয়েরা (বিশেষ করে সোয়াত অঞ্চলে) বিশ্বাস করেছিল যে এটি তাদের হাতের মুঠোয় এবং তারা সোয়াত ও এর আশে পাশে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে, যখন পাকিস্তানি আর্মি ওই এলাকা খালি করে দিল।

মুজাহিদিনরা তাদের নিয়ন্ত্রন বাড়াতে লাগল। তারা 'বুনার' এলাকা যেটি তাদের ঘাটি সোয়াতের লাগালাগি ছিল সেখানে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করল। তখন তারা এই হিসেব করেনি যে তারা যে এলাকা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে তা রাজধানী 'ইসলামাবাদ' এর খুব কাছে। এটি নিঃসন্দেহে রাজধানীর জন্য একটি বড় হুমকি। রাজধানী হল একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শক্তির প্রতীক। সেনাবাহিনী তখন তাদের অস্তিত্বের এই হুমকি মোকাবিলার জন্য তালেবানের মূল শক্তিকেন্দ্রে সুদূরপ্রসারী স্থল আক্রমন শুরু করল। এই অভিযানে ঢেউএর মত সৈন্য এসে তালেবানদের থেকে এলাকা মুক্ত করল। প্রায় দুই মিলিয়ন স্থায়ী বাসিন্দাকে জোরপূর্বক শরনার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য করার পর আর্মিরা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করল।

**একটি নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাও যুদ্ধের একটি কৌশল।**

আল্লাহর প্রতিরক্ষা না থাকায় এবং শক্ত পর্বতময় ভূ-খন্ডের কারণে মুজাহিদিনরা সম্পুর্ণভাবে সোয়াত থেকে মুছে গেল। আমরা শত্রুর শক্তি বেশি বলছি না। আমাদেরকে জানতে হবে নিজের ও শত্রুর শক্তি, তাহলে এমন একশটি যুদ্ধেও ভয়ের কিছু নেই। যেমনটি একজন চীনা দার্শনিক বলেছিলেন, যদি একজন তার শত্রুর ও নিজের শক্তি সম্পর্কে ভালোভাবে জানে তবে বিজয় নিশ্চিত'।

একজন সফল সেনাপতি জানেন যে কখন যুদ্ধ করতে হবে আর কখন বিরতিতে যেতে হবে।

চে-গুয়েভারা'র মতে, "একটি নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাও হল যুদ্ধের একটি কৌশল"।

শত্রুপক্ষের শক্তি বিশ্লেষণ ছাড়া নিজস্ব শক্তি, সামর্থ্য এবং সুযোগ নিয়ে যদি সামরিক অভিযান চালানো হয় তবে এর ফলাফল সম্পূর্ন ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

কোন এলাকায় দখলের আগে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে শত্রু শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানা এবং তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া থেকে একধাপ এগিয়ে থাকা। যদি গেরিলাদের এ ধরনের প্রসারের ফলাফল মোকাবিলা করার সামর্থ্য থাকে তাহলে তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাওয়া উচিত। অন্যথায় তাদেরকে সঠিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করা উচিত যা মুজাহিদিনদের নিশ্চিত বিজয় এনে দিতে পারে। এটি ভুল পদক্ষেপ, যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য যখন তুমি শত্রুদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের প্রথম ধাপের দিকে।

আমি এখানে যেটি বলতে চেয়েছি তাহলো, গেরিলা যুদ্ধের একটি মৌলিক সামরিক কৌশল। সুতরাং এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং একমাত্র মহান আল্লাহই পারেন সঠিক পথ দেখাতে।

২. বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে দখলদারিত্ব

নতুন জিহাদি দলে যারা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে এবং ক্ষমতায়ন চায় শুধুমাত্র শত্রুর উপর কৌশলগত ধাপে ক্ষতি সাধন না করে তাদের উচিত প্রাথমিক পর্যায়ে শত্রুর বিপক্ষে বিশেষ অভিযানে না যাওয়া। যতক্ষন পর্যন্ত না তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য মৌলিক শর্তগুলোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা না পায়।

বিশেষ অভিযান পরিচালনা একটি পূর্ণ যুদ্ধের সমান। যেখানে দুর্বল পক্ষ অর্থাৎ মুজাহিদিনরা শত্রুর প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অপ্রস্তুত থাকে। শত্রুপক্ষ বহু ধরনের অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় তাদের আক্রমনের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধে হঠাৎ তীব্রতা বাড়িয়ে দেওয়াটা গেরিলা দলকে কোনঠাসা করে দিতে পারে। এবং তাদের সমর্থকদের মুখ ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই সমর্থকরা গেরিলাদের জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ যেমন মাছের জন্য পানি। মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না গেরিলা যোদ্ধারাও তেমন সমর্থক না থাকলে টিকে থাকতে পারবে না।

ফলে মুজাহিদিনদের এই ধরনের পদক্ষেপ থেকে

অপরিণামদর্শী আক্রমণের ফল হয় অপ্রত্যাশিত।

বিরত থাকা উচিত। যতক্ষন পর্যন্ত না তারা কর্মসম্পাদনের সকল সামর্থ্য আয়ত্ব করতে না পারেন। যদিও এই ধরনের অভিযান তারা আগেও করে থাকেন।

একটি গেরিলা দল শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু তাদের বিরত থাকা উচিত ঐ অবস্থায় যখন শত্রুর প্রতিক্রিয়া বড়ই বিধ্বংসী। দৃশ্যমান বিশেষ অভিযানের পরিবেশ ততক্ষন পর্যন্ত উপযোগী হবে না যতক্ষন পর্যন্ত গেরিলারা পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন এবং শত্রু পক্ষের ক্ষতির মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। শুধুমাত্র শক্তির এই পর্যায়ে পৌছালেই শত্রুর উপর আঘাত আনা সম্ভব হবে। এজন্য মৌলিক নীতি হল সংগ্রামের প্রত্যেক পদক্ষেপে শত্রুর প্রতিরক্ষা আমলে নেয়া। যাতে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত সঠিক হয় এবং অথর্বের মত পরিনতি না হয়।

যাই হোক, যদি গেরিলা যুদ্ধে সফলতার জন্য পরিস্থিতি যদি উপযোগী না হয় যা এখন অনেক মুসলিম দেশে বিরাজ করছে তখন শুধুমাত্র একটি লক্ষ্য হল শত্রুর ক্ষতি করা যাতে যুদ্ধের দিক থেকে তাদের মন সরে যায়। এ অবস্থায় বিশেষ অভিযান চালানো উচিত। তার জন্য লক্ষ্য দুটি পবিত্র ভূমির যেকোন একটি অবস্থান হতে পারে। মুজাহিদদের জন্য দরকার হল এমন একটি রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করা যাতে এটি তার নিজের নিরাপত্তা নিয়েই সমস্যায় থাকে এবং অন্যদের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে না পারে। যেমন, আফগানিস্থান, ইয়েমেন, ইরাক এবং সিরিয়া।

মুজাহিদিনদের জন্য কখনও বিপর্যয় হবে না যদি না সৌদি রাজ পরিবারের সেখানে হাত না থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি নাই।

৩. মিডিয়ার মাধ্যমে প্রসারঃ

অতি বিস্তৃতির এই চিত্র শুধুমাত্র সামরিক অভিযানে সীমাবদ্ধ নয় বরং গণমাধ্যমও জড়িত রয়েছে। মিডিয়া হল গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য শ্বাসনালী, যার মাধ্যমে তারা নিঃশ্বাস নেয়। আবার শত্রু পক্ষের জন্যও এটি সত্য। গেরিলা যুদ্ধের জন্য মূল ভিত্তি হল সংগ্রামের জন্য বৈধতা পাওয়া এবং জনগণের মন ও সমর্থন পাওয়া।

সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য অতি বিস্তৃতির একটি চিত্র: আফগানিস্তানে সোভিয়েতের ব্যাবহৃত ঘাটিতে ধ্বংস প্রাপ্ত ট্যাঙ্ক সমূহ।

# “গেরিলা অবশ্যই ঝড়ের পূর্বের শান্ত সময়ের মতো হবে, তার পদচিহ্ন দেখা যাবে, তবে শুধুই উপযুক্ত স্থান ও কালে, এবং যথাপযুক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে।”

যুদ্ধের কৌশলবিদ Robert Taber তার বই ‘The War of Flea’ তে বলেছেন যে, ‘যদি কেউ যুদ্ধের বৈধতা অর্জন করে তবে সে যুদ্ধে জিতে যায়’। অভিজ্ঞতাই এই বাণীর সাক্ষী। গেরিলা দলের জন্য গুরুত্বপুর্ণ হল জনগণের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের কাছে লক্ষ্য তুলে ধরা। তাদেরকে সাধারণ লোকদের স্তর বুঝে সময় উপযোগী করে ধীরে ধীরে গণমাধ্যমে বিবৃতি দিতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই জনগণকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তাদের জীবন ও মাল অক্ষত থাকবে। তাদের উচিৎ সাধারণ মানুষের পার্থিব বিষয় গুলোতে হস্তক্ষেপ না করা। গেরিলাদের উচিৎ এমন ধরনের কথা বলা যাতে জনগণের মন জয় করা যায়। বিশেষ করে তাদের নেতাদের, বড়দের, বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের। তাদের উচিৎ জনগণের সাথে হিসেব করে কথা বলা। অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সম্ভাব্য সুবিধার সমন্বয় করা। যা জানা তার সবকিছু বলার প্রয়োজন নেই । আমরা সকল সত্য যাতে বিশ্বাস করি যা সব সময় বা সকল স্থানে বর্ণনা করতে পারি। বরং এসব সত্যের প্রত্যেকটির বর্ণনা নির্ভর করে এর গ্রহণ ও বর্জনের প্রক্রিয়ার উপর। যাই বলা হোক না কেন তা জনগণের মানসিক অনুধাবনের সাথে মিল রেখে করতে হবে। এই বিষয়ের উপর যুগে যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিরা জোর দিয়ে আসছেন।

ভয় দেখানোর সুর গ্রহণ করলে এটি হবে মিডিয়া প্রসারের একটি ব্যর্থ উদাহরণ। বিশেষ করে যখন গেরিলা যোদ্ধারা তাদের যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। এটি আরো বেশী হতে পারে যখন তাদের ওয়াদা পুরণের সামর্থ্য থাকে না। অথবা তারা তাদের হুমকি অনুযায়ী কাজ করতে না পারে। এর ফলে লোকজন গেরিলা যোদ্ধাদের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারাতে পারে। এভাবে আমরা ব্যর্থ হই যাদেরকে নিরপেক্ষ করা যেত সামরিক ভাবে তাদের কাছেও।

অতিরিক্ত দ্বায়িত্বের বোঝা সংগঠনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

সুতরাং মুজাহিদদের যুদ্ধ করার জন্য সবার সাথে চ্যালেঞ্জ করা বোকামি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জীবনি আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে শত্রুকে হারানো যায়। হুমকির বাণী যদি কার্যে পরিনত না করা হয় তবে এটি খুবই ক্ষতির কারণ। এটি গেরিলার দুর্বলতা এবং তাদের ওয়াদা পূরণে অক্ষমতা প্রকাশ করে। অধিকন্তু এটি শত্রুকে শক্তিশালী করে এবং নতুন শত্রু সৃষ্টি করে। *গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য যা প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল না।* গণমাধ্যমের বিবৃতি অবশ্যই সংগঠনের প্রকৃত সামর্থ্যর সমানুপাত হতে হবে। বিশেষ করে যখন ভীতিকর হুমকির বা বিশেষ অভিযানের কথা বলা হবে। গেরিলারা অবশ্যই সে রকম শান্ত যার পূর্বে ঝড় বয়ে গেছে। তার পদচিহ্ন দেখা যাবে তবে শুধুমাত্র সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে এবং সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী। ঔদ্ধত্য এবং মিথ্যা আসার কোন জায়গা নেই তাদের মনে, যারা ইসলামের বিজয়ী হতে চায়। বরং বিষয় হল উদ্দেশ্যর প্রতি গভীরতা, আন্তরিক প্রচেষ্টা, সকল শক্তি ব্যবহার এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস। যিনি একমাত্র সফলতা দিতে পারেন।

৪. সাংগঠনিক কাজে অতিবিস্তৃতিঃ

গেরিলা যুদ্ধের অতিবিস্তৃতির উদাহরণ গুলোর মধ্যে সাংগঠনিক কাজে অতিবিস্তৃতি অন্যতম। এটি ঘটে তখন যখন সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধির যে ধাক্কা তা বহন করার মত সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সাংগঠনকে বড় করা। এর মধ্যে রয়েছে সংগঠনে নতুন নিয়োগ দেয়া এবং প্রশাসন, প্রশিক্ষন, সামর্থ্য গড়ে তোলা এবং অস্ত্র ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে জটিলতা। যার ফলে সংগঠনের উপর দায়িত্বের একটা বোঝা চেপে বসে। যা তার সামর্থ্যের বাহিরে চলে যায় এবং বাস্তব সুযোগ হারায়। বিপরীতে এটি আন্দোলনের সফলতার পথে বাধা হয়ে

হয়ে দাঁড়ায়। সংগঠন পিছনের দিকে হাঁটতে থাকে এবং তাতে ফাটল ধরে। তাদের সদস্যদের একতার অভাবে ও তাদের প্রয়োজন পূরণে এ অসামর্থ্য থাকলে এর ফলে সদস্যরা নিজের সংগঠনের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে যদি কমতে থাকা অথবা নির্ধারিত আর্থিক সম্পদ থাকে এবং সাংগঠনিক প্রশিক্ষনের জন্য দক্ষ লোক না থাকে তবে জটিলতা আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থা আরো খারাপ হয় যদি সংগঠনের নেতা ও সদস্যদের মধ্যকার তথ্যগত দূরত্ব তৈরি হয়। এ ধরণের দূরত্ব অনেক কারণে হতে পারে, যেমনঃ গেরিলা যুদ্ধে পেশাদারী ব্যক্তিকে জানা, যার ফলে সাংগঠনিক পরিসর বৃদ্ধির পূর্বে এ বিষয়ে গবেষনার দরকার। এর বিভিন্ন দিক ও পরবর্তী ফলাফল বিবেচনায় আনতে হবে। সংগঠনের বিপদকালীন সময় পার করার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাতে সংগঠনের সংখ্যা জিহাদী কাজ যারা তত্ত্বাবধান করে তাদের জন্য চাপ হয়ে না দাঁড়ায়।

**উপসংহারঃ**

জিহাদী নেতৃত্ব তার সামর্থ্য, তার সমর্থকদের বা সংগঠনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অবশ্যই ভুল সিধান্ত নিবে না। গেরিলা যুদ্ধে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। লোকজন সর্বদাই শক্তিশালীকে অনুসরণ করে এবং অভিজ্ঞতায় এ বিষয়ে বড় দিক নির্দেশক। লোকজন এখন বিশ্বাসী হলেও একটু পরে অবিশ্বাসী হতে পারে, পাপী হতে পারে। অর্থাৎ দিনের আলোয় বিশ্বাসী রাতের আধারে অবিশ্বাসী। বর্তমান কঠিন সময়ে এটি অনেক বেশি যার ফলে জিহাদী আন্দোলন ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের মুখে পড়ে। আমরা আল্লাহর কাছে চাই যেন শত্রুর ষড়যন্ত্র ধ্বংস করেন, তাদের বানানো ফাদে তারাই পড়ে থাকে, স্রোত যেন তাদের বিপরীতে যায়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান সামর্থ্যের জন্য। □

(*রাজনীতি ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ:* শায়খ আবু উবায়দা আল মাকদিসি)

রসদবাহী কন্টেইনারের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি? এটা কি পুড়িয়ে ফেলতে হবে নাকি লুট করা মাল হিসেবে গণ্য হবে?

# কন্টেইনারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিধান যেগুলো রসদ সরবরাহ করে আমেরিকান ও ন্যাটো বাহিনীর জন্য

■ জামিয়া আল উলম আল ইসলামিয়া, বিনরি টাউন, করাচী

নিম্নোক্ত ব্যাপারে সম্মানিত ওলামাদের মতামত কি?
আমেরিকান বাহিনীর রসদ বহনের জন্য ব্যবহৃত কন্টেইনার যদি মুজাহিদরা বাজেয়াপ্ত করে সেক্ষেত্রে:

- মালামাল গুলোর জন্য বিধান কি? সেগুলো কি পুড়িয়ে ফেলতে হবে নাকি গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য হবে?
- সেইসব কন্টেইনারের চালকের ক্ষেত্রে বিধান কি? তাকে কি মেরে ফেলতে হবে/ বন্দী করতে হবে/ মুক্তিপনের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হবে নাকি শারীরিক নির্যাতন করে ছেড়ে দিতে হবে?
- যদি কন্টেইনারটি চালকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় সেক্ষেত্রে কন্টেইনারটি কি পুড়িয়ে ফেলতে হবে নাকি লুট করতে হবে?

দয়া করে উপরের প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট প্রমান সহ বিস্তারিত জানান।

প্রশ্নকর্তা আবদুল্লাহ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এবং দুরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর জন্য।
প্রশ্ন গুলোর উত্তর হল–

প্রথমেই আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় কাফিরদের যে অর্থ সম্পদ মুজাহিদদের হস্তগত হয় , শরিয়তের ভাষায় তাকে গণিমত বলে।

প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় মুজাহিদদের দ্বারা বাজেয়াপ্তকৃত আমেরিকান মালামাল তা যাই হোক না কেন, গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য হবে। রাসুল (সাঃ) এবং সাহাবীদের (রাঃ) যুদ্ধ গুলোতে এমনই হয়েছিল। রাসুল (সাঃ) যখনি কুরাইশদের কোন কাফেলার খবর পেতেন যারা ব্যবসার মাল নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেছে, তখনি তিনি (সাঃ) সাহাবাদের একটি দলকে সেই কাফেলাকে লুট করার জন্য প্রেরন করতেন। মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করার পর এই ধরনের বেশকিছু অভিযান চালানো হয়েছিল।

মুসলিমদের উপর কাফিরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তাদের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান, বিশেষত যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষ সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য তাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ ও তাদের মালামালকে গনিমতের মাল হিসেবে গ্রহন করাকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি বরঞ্চ অবশ্যই প্রয়োজন বলা হয়েছে।
একজন মুসলিমের জন্য একজন কাফির কে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা, তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা বা যেকোনো ভাবে সাহায্য করা (বিশেষত যা অন্যান্য মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর) শরীয়তে স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। সতর্ক করার পরও যে মুসলমান কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করে বা সাহায্য করে (সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অথবা জেনে বা না জেনে যেভাবেই করুক না কেন) কুরআন তাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এই ধরনের মানুষদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ধমকি দেয়া হয়েছে।
কুরআনে কারীমে আল্লাহ (সুঃ) বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

**“হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদের পথ প্রদর্শন করেননা। ” (সুরা মায়িদাঃ ৫১)**

এই জন্য আমেরিকান সৈন্যদের মাল সরবরাহ করা বা যেকোনো উপায়ে সাহায্য করা সর্বাবস্থায় হারাম এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

প্রশ্নকর্তার উল্লেখিত পরিস্থিতে, যারা আমেরিকা আর ন্যাটোর সৈন্যবাহিনীর কাছে রসদ সরবরাহের সাথে জড়িত (কন্টেইনারটি তাদের নিজেদের হোক বা না হোক) তারা কবিরা গুনাহের সাথে জড়িত এবং মুসলিমদের শত্রু বাহিনীকে সাহায্য করার মাধ্যমে তারা হারাম কাজে লিপ্ত। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে বলা যায়, যে মুসলিম কোন কাফির কে যেকোনো উপায়ে সাহায্য করে (হোক সেটা তাদের পক্ষে যুদ্ধ করার মাধ্যমে অথবা যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে), সে ইসলামের শত্রু এবং শরীয়াহ আইনে সে একজন অপরাধী। সুতরাং এই ধরনের কোন মুসলিম যদি যুদ্ধক্ষেত্রে ধরা পড়ে তাহলে তাকে বন্দি এমনকি প্রয়োজনে মেরে ফেলা যেতে পারে। আর বন্দি করা হলে মুক্তিপনের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া যেতে পারে।

বাজেয়াপ্তকৃত রসদের জন্য যে নিয়ম (গনিমতের মাল হিসেবে) প্রযোজ্য কন্টেইনারের জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কোন কন্টেইনার মুজাহিদদের দখলে আসে তাহলে তা গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য হবে।

আল্লাহ (সুঃ) সবচেয়ে ভাল জানেন।

লেখকঃ
মোহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ হুসেইন
ফেকাহবিদ
জামিয়া আল উলম আল ইসলামিয়া, বিনরি টাউন, করাচী

# আঙ্কেল টম গেলেন আঙ্কেল স্যাম এর সাথে দেখা করতে

**নওয়াজ:** ওবামা সাব... এইডা তো ঠিক না... আপনাদের জন্য এত কিছু করলাম হেরপরেও আপনার প্রশাসন খালি ISI এর নামে কমপ্লেইন করে, ISI নাকি ৫০০% আপনা পকেটে নাই। আরে আমি তো ISI এর জারিজুরি ঠিক রাখতে, আর একে আমার জুতার তলায় আনতে, পাকিস্তানী পুলিশকে ব্যাপুক ক্ষমতা দিছি। দেখেন না, আমার নতুন জঙ্গি-দমন আইন... আম্রিকা প্রোটেকশন অর্ডিন্যান্সের[১] কথা বলছি আর কী...। আপনে জানেন...? বিনা ওয়ারেন্ট অ্যারেস্ট, তিন মাসের রিমান্ড... যারা আমাদের শান্তির জীবনে ডিস্টার্ব করে তাদের জন্য আরও আছে স্পেশাল কোর্ট আর এক্সক্লুসিভ থানা... আই মিন পুলিশ ইসটিশন... আংকেল স্যামকে যাদেরই অপছন্দ হবে তাদেরই এই ট্রিটমেন্ট দেয়া হবে।

**ওবামা:** দ্যাটস রুল অভ ল', দা অ্যামেরিখান ওয়েই... সাব্বাশ! এটাই তো আইনের শাসন, আমেরিকান স্টাইলে। আমি শুধু ভাবি কেন যে কংগ্রেস এই Patriot Act পাশের আগে আপনার সাথে পরামর্শ করলো না!

**নওয়াজ:** হ্যাঁ গো... ইউ মিন আমি খুব Patriot আই মীন দেশপ্রেমিক, তাই না?

**ওবামা:** ওয়েল, ঠিক তা না... বাট লেটস গেট ডাউন ঠু দা বিজনেস: "হোয়েন উইল ইউ ক্লিন দ্য মেস ইন ওয়াজিরিস্তান?"

[১] পাকিস্তান প্রোটেকশন অর্ডিন্যান্স ২০১৩, যা তখনকার জঙ্গিবাদ দমন আইনে আমূল পরিবর্তন আনে।

**নওয়াজ:** বিজনেস! আরিই... ব্যবসা তো আমার ফেভারিট জিনিস। আমি সবখানে ব্যবসা করতে তৈয়ার, দরকার পড়লে বলেন, চাঁদের দেশে গিয়ে বিজনেস খুলব।

**ওবামা:** তুমি আমার পয়েন্টটা ধরতে পারো নি। আমি বলতে চাচ্ছি যে, "হোয়েন উইল ইউ ক্লিন দ্য মেস ইন ওয়াজিরিস্তান?"

**নওয়াজ:** স্যার, আমাকে বলতে দিন... আসলে ওয়াজিরিস্তানে দুইটা বড় বড় মেস আছে... একটা মিরানশাহ ক্যাম্পে আরেকটা ওয়ানা ক্যাম্পে... জেনারেল রাহিলের লোকেরা প্রতিদিনই মেসগুলো পরিষ্কার করে।

**ওবামা:** তোমার ইন্টেলিজেন্সের (বুদ্ধি) তো দেখছি তারিফ না করে উপায় নেই।

**নওয়াজ:** আসলে ইন্টেলিজেন্স (গোয়েন্দা তথ্য) তো এখনো "আলমাস ববি"র[২] রেখে যাওয়া খাকি পরুয়া আর্মির হাতেই আছে... নিসারের সাথে মিলে এদেরকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করছি। এদের লম্ফঝম্ফ একটু বেশিই হয়ে গেছে... একদিন তো হঠাৎ করে ISI এর হেড কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হলাম, দেখি অফিসের কাজ ফেলে কোনোটা আবার বাং-টাং মারে কি না, জানেনই তো আমি আবার অফিস টাইমে আনারকলিতে গিয়ে সিরিপাই খাই আর কী...

[২] আলমাস ববি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন।

**নওয়াজ:** সারি জি গাল আয়ি...! ইয়ে মানে খুব সোজা আর কী। আমরা জরদারীর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো: আমরা পয়সা-পাত্তি আরও ধুমসে ঢালতে থাকবো, ড্রাইভার ছাড়া প্লেন মানে ড্রোনের জন্য আরো intelligence নিয়োগ দিবো। কিন্তু একটা কথা বলে দিলাম যে শান্তি প্রতিষ্ঠা আর আপনাদের ড্রোন বন্ধ করার জন্য আমাদের চিল্লাচিল্লিতে কিন্তু মাইন্ড করতে পারবেন না।

**ওবামা:** হা হা! এতে আরো ডলার একটু বেশি ছাপবে কিনা!! যাকগে তোমার মন্ত্রীদের চোগলখোরীতা দেখে আমি আবার মাইন্ড করবো কেন? তোমার কি মনে হয় যে আমি জানি না ডেমক্রেসি কিভাবে কাজ করে??

**নওয়াজ:** স্যার, ডেমোক্রেসি না আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়। আপনারা বলেছিলেন যে আপনারা ডেমোক্রেসির সাথে আছেন, কিন্তু মিশরে মুরসীর সাথে এটা কি করলেন, ঠিক বুঝলামনা? আমি আসলে দুইবার ধরা খেয়েছি, একবার লাঘারি আরেক বার মোশাররফ, ইশ ওইটা এখনো কষ্ট দেয় রে। আপনি তো জানেন যে আমি মুরসীর চাইতে খারাপ নই, কিন্তু ভয় লাগে এই রকম ক্ষমতা নিয়ে, বোঝেনই তো!

**ওবামা** হা হা হা... কে বলেছে যে আমরা ডেমোক্রেসি তে বিশ্বাস করি না! আমরা তো অবশ্যই করি... যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সঠিক ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আনে। কিন্তু যখন এটা রাইট গাইকে পাওয়ারে আনতে পারে না, তখন আমাদের এত পা চাটা কুকুর আছে যারা আমাদের ট্রিকগুলো ঠিকই জায়গা মত মেরে দেয়।

**নওয়াজ:** হ্যাঁ গো... যেমন??

**ওবামা:** প্লুটোক্রেসি (ধনিকতন্ত্র), কর্পোরেটোক্রেসি (আমলাতন্ত্র), এবং আমার সবচেয়ে প্রিয়... হিপোক্রেসি (ভণ্ডামি)! □

**ওবামা:** কি খাও??

**নওয়াজ:** ছাগলের মাথা আর পায়া... এগুলা না আমার খুব প্রিয়!

**ওবামা:** মিস্টার শরীফ, আমাকে শুধু একটা কথা বলো তো: আফগান বর্ডারে কবে কাজ শুরু করবে? এদিকে বর্ডারের পশ্চিম পাশে আমার ছেলেদের তো টহলদারীর জন্য আরও "ডাইপার" দরকার কি না।

**আলমাস ববি:** ১. পাকিস্তানের হিজড়া সংগঠনের প্রধান। পাকিস্তানের হিজড়ারা সাধারণ তাদের নামের শেষে 'Bobby' লাগায়। এখানে আর্মি অফিসার জেনারেল কিয়ানীকে আলমাস ববি বলা হয়েছে।

২. ২০১০ এর শেষের দিকে জেনারেল কিয়ানীর অবসর নেয়ার পর পাক আর্মির হাই কমান্ড একজন প্রকৃত পুরুষের খোঁজে তিন বছর পর পেল রাহিল শরীফকে। কিন্তু কী পরিহাস! রাহিল শরীফের নিজ পরিবার হতেই খবর পাওয়া গেল যে তার ডাক নামও 'ববি'!!

# আমাদের সাথে যোগাযোগ

মুসলিম উম্মতের মাঝে জিহাদের স্পৃহা জাগানোর জন্য রিসার্জেন্স একটি বিনম্র প্রচেষ্টা। আমরা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি এই প্রচেষ্টায় সহযোগীতা করতে। আপনারা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগে থাকতে চান, বা মন্তব্য বা পরামর্শ পাঠাতে চান, আপনারা নিচের ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আসরারুল মুজাহিদিন প্রোগ্রাম ব্যবহার করা উত্তম। নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখার অনুরোধ জানানো হচ্ছেঃ

১। আপনার পরিচয় লুকাবার সকল ধাপ গ্রহণ করুন।

২। কোন ব্যক্তিগত বা স্পর্শকাতর তথ্য দিবেন না যদিও আসরারুল মুজাহিদিন প্রোগ্রাম ব্যবহার করেন। এটা অনলাইন নিরাপত্তার জন্য একটি মানবিক প্রচেষ্টা। আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারব না যে এই সফটওয়ার ব্যবহার করলে তা শত্রুপক্ষ পড়তে পারবে না।

## Public Key for Asrarul Mujahideen

pyHAvEeqZkhyByXjZiFPuv4fJDeHIAgTFIqhNqRTbhrKCTx2d+
F+K6PsWd8aXN1uQOJJV9t7fMczgZ0uPidZ8zF1Apb7nFiEjHGP
wfg83aQBu88QbmZEPPkksFUP+zn56Qc8+ZK0bzQUkeKip8N
Ss8
YYGf9g3NVzyU4JejfDGuAdaSIT9WELYY7RpOijqzDMsCRkybQv
OyAizeLKE+9SYWhjgpqXmUrcElSuDE/lCYfVgw5ECXTe4aTzaa
fuEafJq2n8lZOldpulATFlQX6nVGFVSHl6HUjkBgXTlW1kkAUv
xFSHwJettaHaQ+Q20bS8cOV4jxRM4V+mp/fBZvrBEfBjxKXp0c
vgM5EasHFlHvvVY/NzJXC5SwWlWQR/dlKWXmhN+t+tvr0rXgtB
XnVSiudNAzd67iOtIdJcMpHIAOYmdAm2rSJ7gQd3He1SDeftWJ
USnJxDVO3wfRqiDOHaMtAecO4FLqzv2C7gi1lWuZFxwcYwuIbk
Bd5Gu95tNU7CQnz4mUBFNQM5YgNvNiDyYjaj01Ik8/dH9jZDtb
7jtOaUySA7vA==

resurgencemag@yahoo.com

*আসরারুল মুজাহিদিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ইন্সপায়ার-১ ম্যাগাজিনটি দেখুন।

কা শ্মি র